০১। উন্নয়নের পথে অন্তরায় দুর্নীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে সেই ধ্রুপদী (Classical) অর্থনীতিবিদদের আমল থেকে। ধ্রুপদী অর্থনীতির জনক বলে খ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) কর্তৃক ১৭৭৬ সালে রচিত An Enguiry into the Nature and causes of wealth of Nations ' নামক গ্রন্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পান। সেখান থেকে শুরু করে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিয়ে নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন মনে করা হতো, কোনো দেশের জাতীয় আয় যদি চলমানভাবে ৫ থেকে ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে তাহলে বুঝতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে। তখন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনকে উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এটি সনাতন একটি ধারণা যা বহাল থেকেছে অনেক দিন পর্যন্ত।

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দিকে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির কিছু অনুষঙ্গ দেখে হোঁচট খেলেন। তারা দেখলেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি লোকজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সুফল বা কল্যাণ ভোগ করতে পারেনি। তখন তারা জাতীয় আয় বৃদ্ধিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা থেকে অন্যত্র দৃষ্টি ফেরালেন। সত্তরের দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে তারা প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পুনঃবন্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। এই মতবাদের প্রবক্তাদের অন্যতম ডাডলি সিয়ার্স (Dudley seers)। তিনি দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অসমতার প্রসঙ্গ আনলেন। তার মতে, যদি এ তিনটি সূচক উঁচুস্তর থেকে একটা সময়ের ব্যবধানে নিচুস্তরে নেমে আসে, তবে সন্দেহাতীতভাবে সংশ্লিষ্ট দেশটির উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মাথাপিছু আয় যদি দ্বিগুণও হয়, আর দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অসমতা যদি সামাজিকভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে বেড়ে যায় কিংবা আংশিকভাবে বেড়ে যায় তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যাবে না।

সময়ের পরিক্রমায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। আধুনিক এ ধারণা শুধু আর্থিক উপাদানকে বিবেচান করেনি, বরং সামাজিক ও কল্যাণের দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। মাইকেল টোডারো আধুনিক এ ধারার অর্থনীতিবিদ। তার মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন ঘটে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূর হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটবে। যার ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আসবে।

উপরের নিতান্ত তাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখলাম অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে তার পরিসরকে ব্যাপকতার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। মাথাপিছু আয় থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পৃক্ততা মানুষের জীবনযাত্রায় আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের সীমা পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে। এখন যদি জাতীয় আয় আকাশ স্পর্শ করে অথচ মানুষ মানবিক সুবিধাবঞ্চিত অবনতিশীল হয়; সন্ত্রাস দুর্নীতিতে জাতি আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে, মানবতা যদি পদে পদে লাঞ্ছিত হয়, দেশে মানবাধিকার অব্যাহতভাবে লঙ্ঘিত হয়, কালো অর্থনীতি দিন দিন ব্যাপকতর হয়, তবে দেশে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে_ এমনটি বলা যাবে না। এখন আবশ্যিকভাবে উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কারণ রাজনীতি অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, প্রভাবান্বিতকরণে ও বিকাশে ব্যাপকতর ভূমিকা রাখে।

আমাদের সমাজে দুর্নীতি একটা সামাজিক ক্যান্সারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ক্যান্সার যেমন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে তারপর শান্ত হয়; দুর্নীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, জবাবদিহিতার অভাব, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট_ এসব সামাজিক ক্ষত দেশটাকে তথা সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু না করে শান্ত হবে বলে মনে হয় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা, খুন, রাহাজানি,

দেশি-বিদেশি কেলেঙ্কারি বিশ্বের মানুষকে বা সচেতন মহলকে দেশটি ও তার অর্থনীতি, রাজনীতি সংক্রান্ত যে বার্তা দেয় তা মোটেও সুখকর ও স্বস্তিদায়ক নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রটির পরতে পরতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা বিস্তার লাভ করেছে_ তা বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপৃত হলো। বিশ্ব জানল যে, মাত্র ১৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান আকারের একটি ছোট অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশি আমানতকারীরা সুইস ব্যাংকে ৩৭২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক আমানত হিসেবে রেখেছে, যা মূলত কালো টাকা।

যাই হোক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্নীতি প্রভাব ফেলে কি-না বা দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে কি-না, তা একটি আলোচিত বিষয়। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা ১৯৬৮ সালের আগে দুর্নীতিকে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে ধরতে রাজি হননি। প্রখ্যাত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল ১৯৬৮ সালে তার বিখ্যাত Asian Drama বইতে বলেছেন উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতিকে প্রতিহত করার কথা। তার এ বক্তব্য প্রথমে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা মানতে রাজি হননি। পরে তারা কথাটির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অর্থনীতি বিশ্লেষকদের ধারণা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে আমাদের বড় অন্তরায় সীমাহীন দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার কোটি টাকার লোকসান দেয়। দুর্নীতির কারণে আমাদের সমাজে হলমার্ক, বিসমিল্লাহ তৈরি হয়; সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়; পদ্মা ব্রিজের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়; সরকারের ঋণ বাড়ে, সমাজের টার্গেট গ্রুপ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়; জিডিপিতে প্রায় ৮১ শতাংশ কালো বা আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমির জন্ম হয়; দেশের বাইরে হাজার হাজার কোটি টাকার পাচার হয়। দুর্নীতি একটা বিষাক্ত বাষ্প, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অরাজকতা ও অব্যবস্থাপনা ছড়িয়ে দেয়, সমাজকে কলুষিত ও শুদ্ধ বিকাশকে প্রতিহত করে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। সমাজকে সামগ্রিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তোলে।

প্রতিবেদন

প্রশ্ন : দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো

উত্তর :

দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার :

দুর্নীতি মানে হলো- নীতিবিরুদ্ধ ও অসদাচরণ। স্বাভাবিকভাবে যা নীতিসমর্থিত নয়, তা-ই দুর্নীতি। দুর্নীতিগ্রস্তরা স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ ঘটিয়ে অন্যায়ভাবে নীতি লঙ্ঘন করে, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনযাত্রার প্রায় সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমেই হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। বর্তমান সমাজে দুর্নীতির অবস্থান এতটাই শক্তিশালী যে দুর্নীতি দমন কমিশনে দুর্নীতিসংক্রান্ত হাজার হাজার মামলা ঝুলে আছে। সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়- সব জায়গায়ই দুর্নীতির কালো ছায়া পড়েছে। রাজনীতিবিদ, আমলা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সমাজের যারা অগ্রবর্তী অংশ হিসেবে বিবেচিত, তাদের সবাই না হলেও অধিকাংশই আজ নৈতিকতাহীন আদর্শচ্যুত এক কলুষিত জীবন যাপন করছে। এ ছাড়া দুর্নীতি আরো বিভিন্নভাবে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। যেমন-

১. প্রশাসনিক দক্ষতা কমিয়ে দেয়।

২. জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

৩. সামাজিক নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও সন্ত্রাস বৃদ্ধি করে।

৪. সরকারের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য কমিয়ে দেয়।

৫. জনগণের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে দেয়।

এককথায় বলা যায়, দুর্নীতি সামাজিক বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস, শঠতা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এসবের ফলাফল হলো একটাই, আর তা হলো দুর্নীতি দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের সব দিক থেকে পিছিয়ে দেয়। তাই আমাদের দুর্নীতির জন্য দায়ী কারণগুলো খুঁজে বের করে তা দূর করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি দুর্নীতি থাকলেও বাংলাদেশে এর প্রসার ব্যাপক ও ভয়াবহ। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে।

যেমন :

১. বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই দুর্নীতি চলে আসছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বিদেশি শাসক-শোষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য এ দেশে এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ আমলা ও মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করা হয়েছিল, যারা দুর্নীতি, প্রতারণা ও বঞ্চনার মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করত।

২. আর্থিক অসচ্ছলতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ। দারিদ্র্যের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সমাজে স্বাভাবিক উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক বা অনৈতিক উপায় অবলম্বন করেছে। যার প্রভাবে সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটছে।

৩. বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অনেকে অবৈধ উপায়ে এবং ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করে। আবার চাকরি পাওয়ার পর তারাও পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি ক্রমে বাড়তেই থাকে।

৪. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫. দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর গোপন আঁতাত থাকায় শক্ত হাতে দুর্নীতি দমন করার ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত দুর্নীতির প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করার জন্য এসব পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. বাংলাদেশের সর্বস্তরের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সব প্রাসঙ্গিক ইস্যু মূল্যায়ন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ নাগরিকদের সমন্বয়ে অনতিবিলম্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

২. বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের জন্য ন্যায়পালের পদ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সরকারি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত নিরপেক্ষভাবে সম্পাদনের জন্য ন্যায়পালের অফিস প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৩. দুর্নীতি প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। এ জন্য শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত আইনের অধীন পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. আইনের ফাঁক বা অস্পষ্টতার সুযোগে কেউ যাতে দুর্নীতি করতে বা দুর্নীতি করে শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. দুর্নীতি দমনের আদর্শ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো মানুষের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতিই এ দেশের সব অর্জন এবং জাতীয় উন্নয়নের সব প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। তাই জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাদের দুর্নীতি নামের এই সর্বনাশা ব্যাধির মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

প্রতিবেদকের নাম ও ঠিকানা : .....

প্রতিবেদনের শিরোনাম : দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার

প্রতিবেদন তৈরির সময় : .....

০২।সামাজিক অবক্ষয় এবং আমাদের নৈতিকতা

অবক্ষয় শব্দের আভিধানিক অর্থ "ক্ষয়প্রাপ্তি", সামাজিক মূল্যবোধ তথা সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, উদারতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, নান্দনিক সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম, কল্যাণবোধ, পারস্পরিক মমতাবোধ ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী লোপ পাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে সামাজিক অবক্ষয়।

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণগুলো নিম্নরূপ:

সহনশীলতার অভাব : সমাজে পারস্পরিক সহনশীলতার অভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। যেমন- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহনশীলতার অভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস : সমাজে সংহতির অন্যতম মাধ্যম ধর্ম। ব্যক্তির আচরণ ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কাজটি করা উচিত আর কোনটি নয়-এ বোধ ধর্মীয় অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয়। ফলে ধর্মের গুর"ত্ব হ্রাস পেলে সমাজে অবক্ষয় দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব : রাষ্ট্র ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে ও আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক অবক্ষয় ঘটে।

সামাজিক ভারসাম্যহীনতা : আমাদের সমাজে এক ভয়াবহ ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাস্পরিক সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে।

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন : নগরায়ন ও শিল্পয়নের ফলে গ্রামীণ সমাজে ভাঙ্গন ধরে। এ জন্যেও মূল্যবোধের অবনতি ঘটে। বর্তমানে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রসারে বস্তি জীবনের বিকাশ ঘটছে। পরিবেশেগত কারণে বস্তির শিশু-কিশোররা অনেক সময় অনৈতিক কাজ করে।

দারিদ্রতা : অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা দারিদ্রতার কারণেও সামাজিক মূল্যবোধ লোপ পাচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তথা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহের কারণেও সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে।

বেকারত্ব : বেকারত্বের কারণে অনেক সময় যুব সমাজ অন্যায় পথে ধাবিত হয়, লিপ্ত হয় চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই ইত্যাদি জগন্যতম কাজে। ফলে সমাজে যুব সমাজের চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে।

দুর্নীতি : অপসংস্কৃতি ও দুর্নীতি সামাজিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

অশ্লীলতা : অশ্লীলতা ও কুর"চিপূর্ণ চলচ্চিত্র ও নাটক সামাজিক অবক্ষয়ের জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব : উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায়, অপর দিকে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবেও সমাজে বিপর্যয় ও হতাশা দেখা দেয়। এতেও সামাজিক অবক্ষয় ঘটে থাকে।

পেশী শক্তির প্রভাব : সমাজে পেশী শক্তির জয়জয়কার বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বৃত্তায়নের কারণেও সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে।

সুশাসনের অভাব : সুশাসনের অভাবেও সামাজিক অবক্ষয় ঘটে থাকে।

মাদকের আগ্রাসন : বর্তমানে আমাদের দেশে মাদকের আগ্রাসন এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যুবক- বয়স্ক থেকে শুর" করে এখন শিশুরাও পর্যন্ত এর ছোবলে আক্রান্ত। ফলে সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সামাজিক অবক্ষয় রোধে গণমাধ্যম খুবই গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি জীবনে কতিপয় গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে উদ্যোগ, উদ্যাম, নিয়মানুবর্তিতা, আগ্রহ, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, সততা ও পরিশ্রম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই উপরে উল্লেখিত গুণাবলী সুপ্তাব্যবস্থায় থাকে।

এই সুপ্ত গুণাবলী জাগ্রত করতে সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বলা হয়, Newspaper is the people's parliment always in Session মন্তব্যটি সর্বতোভাবে সার্থক। সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম আক্ষরিক অর্থেই জনগণের সদাজাগ্রত লোকসভা। গণমাধ্যম প্রত্যেক মানুষকে তার মানবীয় গুণাবলী বিকাশ ঘটাতে ও অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। দেশ প্রেমের অনুভূতি মানুষের অবচেতন মনের স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে। মানুষের এই দেশপ্রেমকে জাগরণ করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এবং সামাজিক অবক্ষয়রোধে সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

দারিদ্র বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস দমন, কর্মসংস্থান তৈরী, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন, সাহিত্য সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রেখে গণমাধ্যম সামাজিক অবক্ষয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সংবাদপত্রে তথা গণমাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা এবং উত্তরণের বিষয়ে থাকে যথাযথ আলোচনা ও দিকনির্দেশনা। গণমাধ্যম মূলত সমাজের দর্পণ স্বরূপ।

সমাজের চিত্র গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। কোথাও গণস্বার্থ পদদলিত হয়ে মুষ্টিমেয়র স্বার্থ স্বীকৃত হলে গণমাধ্যমের নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠে।

তাছাড়া সংবাদপত্রে জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জাগ্রত গণমতকে প্রতিফলিত করে সংবাদপত্র পালন করে তার পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব, এভাবে যখন সারাদেশে প্রবল জনমত গড়ে উঠে তখন নীতিভ্রষ্ট স্বৈরাচারী সরকারকেও নিরুপায় হয়ে শাসকের আসন থেকে নেমে আসতে হয় এবং জনগণের কথা, দায়িত্ব বহনে অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করে তাকে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়।

কাজেই গণমাধ্যম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সত্যের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করছে। তবে সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমকে সর্বদায় দলমতের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্ভীক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা আবশ্যক।

সরকার ও জনগণের মধ্যে গণমাধ্যম সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

গ্রামীণ জনগণের নানা সমস্যা গণমাধ্যমে প্রচারের ফলে সরকার ঐ বিষয়ে সঠিক সময়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে এমনকি যে কোন বিষয়ে জনগণের মতামত তৈরীতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সমাজে প্রত্যেককে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে হলে তাদের মধ্যে নীতিজ্ঞান ও সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা সচেতন হলে কোনো রকম অন্যায়, কুমন্ত্রণা তাদেরকে বশীভূত করতে পারবে না।

ফলে উক্ত সচেতনতা তৈরিসহ সামাজিক অবক্ষয় রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

০৩। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষার প্রভাব

এ পৃথিবীতে নারীর জন্ম হয় মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। বিশ্ব সভ্যতায় কখন থেকে নারীকে মানুষ হিসেবে না ভেবে নারী হিসেবে ভাবা হয় সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে এটা জানা যায় যে, নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছিল ইতিহাসের দাসপ্রথা শুরু হওয়ার পূর্বে এবং আদিযুগে নারীর সেই দাসত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। বিভিন্ন কারণে আদিম যুগে শারীরিক শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হত। প্রকৃতিগতভাবে নারী পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল। এই দুর্বল দিকটা বিবেচনা করে পুরুষ নারীকে অধস্তন ভাবতে থাকে। এক সময়ে নারী ছিল শুধুই পুরুষের কল্পনা। পুরুষ তাকে ভেঙ্গেছে, গড়েছে, ভালোবেসে চলছে- "অর্ধেক মানবী তুমি" অর্ধেক কল্পনা"। নারী আনন্দিত হয়েছে পুরুষের বন্দনায়। সুখী সুন্তুষ্ট হৃদয়ে বন্দি থেকেছে পুরুষের কব্জায়। চোখ মেলে দেখিনি বাইরের আলো। কিন্তু আজ দিন পাল্টেছে-আকাশের মত মনোজগতের রংও বদলেছে। নারী আজ প্রতিবাদ করছে। ভেঙ্গেছে পুরুষের কল্পনা। পান থেকে চুন খসাবার মত খসিয়েছে সংস্কার। আজ শুধু নারী স্মৃতি নয়, নয় কল্পনা-সুতোয় বোনা শুধুই সোনালী উপমা নয়, নয় আকাংখার উৎস। নারী আজ পুরুষের সহযোগী, সহকর্মী ও সহমর্মী।

www.facebook.com/tahbir.ebooks

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়- নারী কি সত্যি স্বাধীন? নারী কি তার আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা পরাধীনতার শেকল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফের গড়তে পেরেছে আনন্দের বাজুবন্ধ? মুক্তি পেয়েছে কি পুরুষের শাসনের রক্ত চক্ষু থেকে নারী কি তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে ছুঁতে পেরেছে সাফল্যের সুউচ্চ প্রাচীর? না, পারেনি। উন্নত ও অনুন্নত দেশের কোন নারীই মুক্তি পায়নি নির্যাতনের লাল চাকুকের আঘাত থেকে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল নারী জাগরণের ধারাবাহিকতায় শিক্ষার একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘাটতি। বিশ্বে ১২০ কোটি নারী পুরুষ অশিক্ষিত। তার মধ্যে ৭৬ কোটি নারী ২০ কোটি শিশু আদৌ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। তাদের মধ্যে ৬ কোটি ৫০ লাখ কন্যা শিশু। বিশ্বে পুরুষের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ নারী অশিক্ষিত। বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ নারী এবং ৪০ ভাগ পুরুষ নিরক্ষর। ১৯৮১ সালে নারী শিক্ষার হার ছিল ১৬% এবং তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৫%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়েদের ভর্তির হার ৮৮.৯%।

নারী নির্যাতনে 'নির্যাতন' কথাটির অর্থ পাশবিকতা, অত্যাচার, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক ও মাসিক বল প্রয়োগ। অন্যায় ও উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুর আচরণ যা মানবীয় গুণাবলীর পর্যায়ে পরে না। নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ এর আওতায় যে বিষয়গুলো এসেছে, তা হলো ধর্ষণ করে হত্যা, যৌতুকের কারণে গুরুতর আহত করে মৃত্যু ঘটানো, নারী পাচার, নারী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন ভাবে হস্তান্তর করা, পতিতাবৃত্তি বা অবৈধ সহবাস বা বে-আইনী নীতি বিগর্হিত কাজে নারীকে নিয়োজিত করা অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করা, ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় ফতোয়াবাজীর নামে নারীকে নিগৃহীত করা।

রওশন জাহানের গবেষণা গ্রন্থ 'হিডেন ডেনজার উইমেন অ্যান্ড ফ্যামিলি ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ" বইটিতে তিনি বুঝায়েছেন চারটি জিনিসকে। (ক) দৈহিক নির্যাতন, (খ) যৌন নির্যাতন, (গ) মানসিক নির্যাতন, এবং (ঘ) প্রিয় কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্যাতন। এসবগুলোর মধ্যে দৈহিক নির্যাতনটিই সবচেয়ে বহুল পরিচিত।

সংগতকারণে শিক্ষা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম নারী নির্যাতনের ভয়াবহতারোধে ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মানবীয় সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়। মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে শেখে এবং যার প্রভাবে পাশবিক ও নিষ্ঠুর মানসিকতার বিলুপ্তি ঘটে। জ্ঞান ছাড়া ব্যক্তিসত্বার পূর্ণতা আসে না। শিক্ষাই সেখানে একমাত্র চালিকা শক্তি। পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে নারী শিক্ষার অধিকার আছে, শুধু অধিকার নয়-অগ্রাধিকার আছে। নারীকে ব্যবহারিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূঁড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই তার দৈহিক চাহিদা বিকাশের পাশাপাশি বিবেকি শাসন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের সর্বাদিক গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ নারী তার জ্ঞানের এই উৎকর্ষ দ্বারা পুরুষের চেয়ে সমাজে বেশি অবদান রাখতে পারে। মা-ই তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক। শিশুর প্রথম সামাজিকীকরণ তার মায়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে সুশিক্ষিত নারী স্বভাবতই জ্ঞানী, চরিত্রবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নিষ্ঠাবতি, ভদ্র ও নম্র হয়ে থাকেন। তাই নারী নির্যাতনের বিপরীত শক্তি হিসেবে শিক্ষাই বাস্তব ও যুক্তিসংগত উপাদান হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

নারী নির্যাতন রোধের যতগুলো উপায় বা পন্থা আছে তার মধ্যে নৈতিক শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে মনোদৈহিক পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য বিষয় যা মানুষের প্রেরণাগত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মকান্ডে শারীরিক দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ় চিত্ততার জন্ম দেয়। একজন শিক্ষিত মহিলা তার প্রতিবেশীর উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেন। আজ আমাদের দেশে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনমূলক পাঠ্যক্রমের বাধ্যবাধকতা নেই। পারস্পারিক ভাব-বিনিময়, আচরণ, ভদ্রতা, নম্রতা দিয়ে একজন শিক্ষিত নারী তার প্রতিবেশীদের আকৃষ্ট করে পুরো পরিবেশকেই সুখকর করে তুলতে পারেন। প্রয়োজনে শিক্ষিত নারী শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, কলা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের যে কোন শাখায় বিচরণ করতে পারবে। সুশিক্ষা মানুষকে আলোচিত করে, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সকল পর্যায়ে তারা ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। যেহেতু ইসলাম ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মে নারী শিক্ষার

উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেহেতু শিক্ষিত নারীরা সমাজে তাদের মেধা ও শিক্ষার অবদান রাখবেন এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ পরিবারেই ধর্মীয় ও মানবীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী শিক্ষার মনোস্তাত্ত্বিক প্রচার প্রয়োগের ব্যবস্থা নেই, যার কারণে আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও উচ্ছৃংখল আচরণে অভ্যস্ত হয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের ফাঁদে পরে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত, অবহেলিত ও শোষিত হচ্ছে। আমাদের এই অনুন্নত দরিদ্র দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের বর্তমান বিনোদনের মাধ্যম মাত্র দুটি। একটি টেলিভিশন অন্যটি চলচ্চিত্র। ঘরে বসে টেলিভিশন ক্যাবল চ্যানেল ঘুরিয়ে যে রকম অশ্লিল অঙ্গভঙ্গির নৃত্যগীত সম্বলিত উত্তেজক অনুষ্ঠান দেখা হয় তাকে কেবল যুবকরাই নয় নারীরাও অসুস্থ চিন্তা ও মানসিক বিকৃতি আচরণে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে এক শ্রেণীর প্রকাশক ও লেখক আছেন যারা প্রেমও শিল্পকলার নামে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য রচনা করে তা উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণী পাঠকের কাছে হট কেক এর মত বিক্রি করে দেদার উপার্জন করছেন। আধুনিকতার নামে নারী দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে রচিত অশ্লিল কবিতার ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায় সর্বত্র। এগুলোকে আবার এক শ্রেণীর বুর্জোয়ারা উৎসাহিত করেন এবং আধুনিক শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ বলে মনে করেন। আজ আমাদের দেশের তৈরি চলচ্চিত্রের দিকে চোখ রাখা দায়। কাহিনী সেখানেই গৌণ। নারী দেহের প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে উঠে। কারণে অকারণে নতৃত্যের নামে অশ্লীল, অঙ্গভঙ্গি, লাফালাফির দৃশ্য আজ আমাদের কোমলমতি তরুণ-তরুণীরা লুফে নিচ্ছে। তরুণ সমাজে অস্বাভাবিক যৌন বিকার ও অপরাধ প্রবণতার এক ভয়ংকর বিপদ সংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছে। নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষাই এর অনেকাংশে দায়ী।

নারী নির্যাতনের মত গৃহীত অপরাধ দরিদ্র বেকার ও অশিক্ষিত নারীদের মধ্যে বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। যার প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। শিক্ষা নারীর অগ্রতিতে মূল চালিকা শক্তি। শিক্ষা নারী জীবনের সকল রকম অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোড়ামি দূরে করে মানসিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। শ্রমজীবী নারীদের ৫০ ভাগই কখনও স্কুলে যায়নি অথবা স্কুলে ভর্তি হলেও কোন রকম হাতেখড়ির বেশি এগুতে পারেনি। এই নারী শ্রমিকদের ৭০ ভাগ তাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। আইনে সকল নারীর কোন নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। এ সকল নারী শ্রমিক অবহেলিত এবং নির্যাতিত। এদের শ্রম ঘন্টা বেশি অথচ মজুরি কম, কারণ এরা অশিক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত। এ সমস্ত শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ও প্রেরণা জাগ্রত করতে হলে দীর্ঘ সময়ের জন্যে তাদের প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষাক্রম তৈরি করাই হবে উত্তম পন্থা। তা না হলে সে শিক্ষা তাদের জীবনের জন্য অর্থহীন বলে মনে হবে। শ্রমজীবী নারীদের জন্যে আরো কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সমাজের ছিন্নমূল দরিদ্র বেকার নারীদের জন্যে আরো কিছু উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কিছু কিছু কাজও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজেও নারী নির্যাতন হয়ে থাকে। সেখানে শিক্ষার অবক্ষয়, সেই সঙ্গে মানবিক মুল্যবোধ কাজ করে না বরং এক ধরণের মাসিক অসুস্থতা কাজ করে। যা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে সংঘটিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করলে পরবর্তীতে আমাদের কোন নারী শ্রমিককে কোন রকম সমস্যার আবর্তে পড়তে হবে না। সেই নারীরা কোন দিনই ঘরে-বাইরে সচরাচর নির্যাতিত ও অবহেলিত হবে না। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষা এক যুগান্তকারী ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। নারীর প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের চিরন্তর বৈষম্যের পটভূমিতে যুগে যুগে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয় নিশ্চিত অধিকারহীনতার দিকে। নারীর অস্তিত্ব রক্ষায় সামান্যতমত প্রচেষ্টাকেও সমাজপতিরা মেনে নিতে পারেন নি। নির্যাতনের শিকার নারী ও মেয়ে শিশুরা প্রায়শ আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। অন্যদিকে সচেতনদের অনেকেই সামাজিক ও দমননীতির কারণে আইনের আশ্রয় নিতে পারে না নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নির্যাতন বিরোধী প্রচারণা। সামাজিক ও প্রতিবাদ আন্দোলন, তথ্য সংগ্রহ সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের পদক্ষেপ, নির্যাতিতাদের প্রয়োজনে আইনগত সাহায্য ও আশ্রয় এ সবের ব্যাপক

www.facebook.com/tahir.ebooks

ব্যবস্থা দরকার। সরকার নারী আন্দোলনসহ এনজিও সমূহের পরিপূরকতায় নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের নির্যাতন দমন ও নির্মূল করাকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

নারী ও মেয়ে শিশুরা আজও পুরুষের তুলনায় অপুষ্টি ও অশিক্ষার শিকার হচ্ছে বেশি। তারা নির্যাতিত হচ্ছে পাচারের মাধ্যমে, ফতোয়ার দ্বারা দারিদ্রতার কারণে, গৃহ পরিচারিকা হিসেবে।

সুপারিশ মালা ঃ

বাংলাদেশের মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মহাসচিবের সুস্পষ্ট মন্তব্য হলো_ মেয়েদের জন্য মর্যাদা নিয়ে বাঁচাই হলো বড় কথা। অন্যদিকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের প্রকল্প পরিচালকের মতে যৌতুকের কালো থাবা থেকে রক্ষার জন্য নারী শিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম নিতান্তই জরুরি। সর্বস্তরে নারী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার হাতে পারে না। এ জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা হলো_

(১) স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) নারী শিক্ষাসহ সকল শিক্ষার অগ্রগতি সাধন করতে হবে। (৩) অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করতে হবে। (৪) অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের যাবতীয় উৎসমুখ বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৫) দরিদ্র ও বিবাহযোগ্য মেয়েদের জন্য বিবাহ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (৬) আইন-শৃংখলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নিষ্ঠার সাথে অপরাধ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। (৭) রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০৪ রাজধানীতে মশার উপদ্রব

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার কারণে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন সব কিছুই ঢাকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যার কারণে ঢাকার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও মনোযোগ সব সময়েই বেশি। আয়তনের দিক থেকে ঢাকা এমন কোনো বড় শহর নয় যে পৃথিবীর বড় বড় নগরকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান নগরী এবং জঞ্জালময় ও অপরিকল্পিত নগরী হিসেবে রাজধানী ঢাকা দীর্ঘদিন থেকেই বেশ আলোচিত-সমালোচিত। ঢাকায় সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যার পর সমস্যা পাড়ি দিয়ে ঢাকাবাসীর দিন যায় রাত আসে। এখানে রয়েছে গ্যাস, পানি ও মারাত্মক পরিবহন সঙ্কট। রয়েছে অসহনীয় জানজট এবং তীব্র আবাসন সঙ্কট। রাজধানী ঢাকার রাস্তাঘাট ড্রেন ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা, ফুটপাত, দালান-কোটা কোনোটিতেই পরিকল্পনা ও নান্দনিকতার ছাপ নেই। এখানে রয়েছে চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী ও অজ্ঞান মলম পার্টির দৌরাত্ম্য। জননিরাপত্তা প্রতি পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে এ স্বপ্নের ঢাকায়। কারণ মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে ফিরতে পারবে কিনা সে নিশ্চয়তা নেই। বেকার সমস্যাও ঢাকায় প্রকট। কারণ সবাই কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকায় ছুটে আসে। বলতে গেলে নূযনতম নাগরিক সুবিধা ঢাকায় নেই। ফলে এক সময়ের স্বপ্নের ঢাকা এখন পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নের নগরীতে। ঢাকাকে তিলোত্তমা শহরে পরিণত করতে বা এর সৌকর্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের বাসোপযোগী করতে সরকার কিংবা ঢাকা সিটি করপোরেশনের কোনোরকম উদ্যোগ

কিংবা তৎপরতা আমাদের চোখে পড়েনি। অন্যদিকে মারাত্মক ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে ঢাকা। ঢাকার বেশিরভাগ মানুষই নরক যন্ত্রণা ও মৃত্যু আতঙ্ক নিয়ে বসবাস করছে।

এসব সমস্যার পাশাপাশি এবার শীত যেতে না যেতেই রাজধানীতে নতুন আতঙ্ক ও উপদ্রব হিসেবে দেখা দিয়েছে মশার উপদ্রব। এতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে নগরবাসী। এ উপদ্রব যে নতুন তাও নয়। অথচ এ নাগরিক উপদ্রব নিরসনে কর্তৃপক্ষের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই। তবে ড্রেন, নর্দমার ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার না করা এবং মশক নিধন কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষের ঢিলামিই মূলত এ উপদ্রবের উল্লেখযোগ্য কারণ। নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর কথা বলে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হলেও সেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিলতা আরো বেড়েছে এবং নগরবাসী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ মশক নিধনের ব্যাপারে বরাবরের মতো লোকবল সঙ্কটের দোহাই দিচ্ছেন। মশক নিধনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছেন না। তবে, মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য জনসচেতনতার ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মশার উপদ্রবে নাকাল রাজধানীবাসী। রাতে তো বটেই দিনের বেলায়ও অনেক এলাকায় মানুষকে মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হতে হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। মশার কামড়ে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়ার মতো কঠিন রোগ হতে পারে। তাই মশক নিধনে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা বাড়ানোর পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

তবে যেখানে পরিষ্কার পানি জমা হয় এরকম পাত্র, ফুলের টব, হাঁড়ি-পাতিল এসব বাড়ির পাশে বা ঘরে না রাখাই উত্তম। কারণ এসব এডিস মশার বিস্তার ঘটায়। ফলে প্রতি বছরই আমরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রত্যক্ষ করি। বিশেষজ্ঞের মতে, অতিরিক্ত মশার ওষুধ ব্যবহার করা পরিবেশ ও মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই নগরবাসীকে বাড়ি ও আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। তার আগে উচিত মশক নিধনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হেঁয়ালি বা উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য নয়।

০৫ ঢাকা শহরের নগর পরিকল্পনা, আবাসন ও শিল্পায়ন

একটি ঘনবসতিপূর্ণ নগরীর আবাসিক এলাকায় কলকারখানা-গুদাম ইত্যাদি থাকলে পরিবেশ দূষণ ছাড়াও কী ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটতে পারে, তা শতাধিক প্রাণ কেড়ে নেয়া পুরোন ঢাকার নিমতলী দুর্ঘটনা আমাদের হাতেনাতে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সমস্যাটি সমূহ হুমকি হয়ে এখনও বিরাজমান। ঢাকা সিটি করপোরেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজধানী ঢাকায় আড়াই লাখ ছোটবড় শিল্পকারখানা রয়েছে। যার সিংহভাগই পুরোন ঢাকার আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। উপরন্তু রাজধানীর দশটি থানা এলাকায় কমপক্ষে ৫৫ হাজার অবৈধ কারখানা রয়েছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ঢাকার প্রতিটি আবাসিক এলাকা একদিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদিকে নানাপ্রকার কলকারখানায় ভারাক্রান্ত। কলকারখানাগুলির শতকরা ৮৫ ভাগ রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক ভবন বা বাসাবাড়ীতে অবস্থিত। এক শ্রেণীর বাড়ীওয়ালা বেশী ভাড়ার লোভে কলকারখানার উদ্যোক্তার নিকট বাড়ী ভাড়া দেন। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা এসব কারখানার ভবনগুলো যে কোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে বা অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

www.facebook.com/mubinbooks

একটি মহানগরীতে আবাসিক এলাকা যেমন সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও অনুমোদন ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি কলকারখানা গড়ে তুলতেও প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন। কলকারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান রয়েছে। দমকল বিভাগেরও লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদন ও তদারকির বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও রাজধানীর আবাসিক এলাকায় এতসব কলকারখানা গড়ে উঠল কীভাবে, এটা একটি বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তলিয়ে দেখতে হবে। ঢাকা স্বাধীন দেশের রাজধানী হবার আগে বিকাশমান এই নগরীতে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলায় দৃষ্টি দিয়াছিল তৎকালীন ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই আমলের পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাগুলো, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আগের সেই রূপ-বৈশিষ্ট্য আর ধরে রাখতে পারে নাই। জনসংখ্যার চাপে পরিবর্তিত হয়েছে অনেক কিছু। সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা ও সরকারী নির্দেশনার অভাব এবং সেই সাথে সরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার সুযোগে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোটবড় কলকারখানা। কারণ, যথাযথ সুযোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও অর্থনৈতিক চাপে বাণিজ্য ও শিল্প বসে থাকে নাই। এক কোটিরও অধিক জনসংখ্যার চাপ নিয়ে রাজধানী ঢাকা আজ নানা ক্ষেত্রেই সমস্যার পাহাড়ে মুখোমুখি হয়ে আছে। সৃষ্টি হয়েছে দুর্বিষহ যানজট, পরিবেশদূষণসহ নানাবিধ সমস্যা। 'পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন' যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়ায় নগরীর আবাসিক এলাকাগুলো বর্তমানের বিশৃঙ্খল চেহারা পেয়েছে।

এ কথা সবার জানা যে, প্রতিটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশে শিল্পকারাখানার জন্য পৃথক অঞ্চল নির্ধারিত রয়েছে। আমাদের দেশে দাবী করলেই রাজধানীর আবাসিক এলাকাগুলো রাতারাতি স্বপ্নের মতো সুন্দর কিংবা বিশৃঙ্খলা ও অবৈধ স্থাপনামুক্ত হবে, এমন আশা অযৌক্তিক। তবে রাজধানীর আবাসিক এলাকার পরিবেশ ও পরিকল্পিত আবাসন-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলো বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারে। পুরোনো ঢাকায় অবৈধ কলকারখানা ও কেমিক্যাল গুদামগুলো ভয়াবহ হুমকি হয়ে উঠায় সেগুলো কামরাঙ্গীরচর ও কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একইসঙ্গে রাজধানীর আবাসিক এলাকায় এবং যত্রতত্র অপরিকল্পিত যত কলকারখানা গড়ে উঠেছে, সেসবের পুনর্বাসন নিয়েও ভাবতে হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সুদূরপ্রসারী সমন্বিত নগর-পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। এই ব্যাপারে ঢাকা শহরের নাগরিক ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরও সচেতন ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে।

০৬ রাজধানীর জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ

ঢাকাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করার স্বপ্ন অনেক দিনের। ঢাকার বয়স ৪০০ বছরের বেশি হলেও এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটানো আজো সম্ভব হয়নি। রাজধানী হিসেবে এর সৌকর্য বৃদ্ধি করে জনসাধারণের বাসোপযোগী করতে সরকার কিংবা ঢাকা সিটি করপোরেশনের কোনো রকম উদ্যোগ কিংবা তৎপরতা আমাদের চোখে পড়েনি। আয়তনের দিক থেকে

ঢাকা এমন কোনো বড় শহর নয় যে পৃথিবীর বড় বড় নগরকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান নগরী এবং জঞ্জালময় ও অপরিকল্পিত নগরী হিসেবে রাজধানী ঢাকা দীর্ঘদিন থেকেই বেশ আলোচিত সমালোচিত।

আমাদের প্রশ্ন ঢাকাকে দুই ভাগ করে কী লাভ হলো? ঢাকায় যদি নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি না পায়, ঢাকা যদি পরিচ্ছন্ন ও জঞ্জালমুক্ত উৎকৃষ্ট নগরীর অভিধা না পেয়ে নিকৃষ্ট ও দূষিত নগরীর অভিধা পায় তা হলে একে রাজধানী বলা যায় কি? এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি আপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুম শুরু হলেই রাজধানীবাসীকে এ ভোগান্তিতে পড়তে হয়। মাঝারি ধরনের বৃষ্টিতেই সোমবার অচল হয়ে গেল রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা মগবাজার-মৌচাক-শান্তিগর। রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনগুলো বিভিন্ন স্থানে আটকে যাওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ জট। বর্ষা মৌসুমে এ এলাকায় চলাচলকারীদের ভোগান্তি নতুন না হলেও মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার নির্মাণকাজের কারণে এটি বেড়েছে বহুগুণ। এ ছাড়াও মতিঝিল, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, শেওড়াপাড়াসহ রাজধানীর বহু জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকার মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও অনেকেই গন্তব্যে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। জলাবদ্ধতা না কমায় এবং গাড়ির চাকা না ঘোরায় শেষে জামা-কাপড় গুটিয়ে জুতা হাতে নিয়ে হাঁটু পানিতে হেঁটে যেতে হয়েছে তাদের। জলাবদ্ধতার কারণে বেশ কিছু গাড়ি রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের অনেকেই চালক রেখে চলে যান। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, ট্রাফিক পুলিশকেও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে।

আসলে রাজধানী ঢাকায় সমস্যার অন্ত নেই। নেই নূ্যনতম নাগরিক সুবিধা। জননিরাপত্তা এখানে পদে পদে হুমকির সম্মুখীন। শহরকে প্রকৃত শহরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হলে নাগরিকসেবা নিশ্চিতসহ ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, দূর করতে হবে জলাবদ্ধতা এবং এর কোনো বিকল্প নেই। কেবল তা হলেই নাগরিকসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

এ কথা সত্য যে, স্বপ্নের রাজধানী ঢাকা এখন নানা কারণে দুঃস্বপ্নের দুর্ভোগের জঞ্জালময় নগরীতে পরিণত হয়েছে। ঢাকার ফুটপাত বেদখল হাঁটাচলার সুযোগ নেই, রাজধানীতে রয়েছে সীমাহীন যানজট সামান্য কাজে বের হলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঢাকার অনেক জায়গা ডুবে যায়। স্থায়ী জলাবদ্ধতাও রয়েছে ঢাকার নিম্নাঞ্চলে। ঢাকার অলিগলি খুবই ঘিঞ্জি। ঢাকার যেখানে-সেখানে বস্তি গড়ে উঠেছে। ঢাকায় রয়েছে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সমস্যা, রয়েছে পরিবহন ও আবাসন সমস্যা। এ ছাড়াও নগরীতে ক্রমেই অপরাধ বাড়ছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, এসিড সন্ত্রাস, মাদক ব্যবসা প্রভৃতি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। ফলে নাগরিক সেবাবঞ্চিত রাজধানীবাসী আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

নগরীতে বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমে যাওয়া বা রাস্তা ডুবে গিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়া কোনো ভালো লক্ষণ নয়। কেবল তাই নয়_ রাজধানী ঢাকা এখন অপরিচ্ছন্ন শহর। অনেক জায়গায় নাকে রুমাল দিয়ে চলাচল করতে হয়। এখানকার বায়ু দূষিত। শব্দদূষণের কারণে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। শহরের ভেতরে-বাইরে মারাত্মক পরিবেশদূষণের কারণে ঢাকা শহরের মানুষ প্রতিনিয়ত অ্যাজমা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ মারাত্মকভাবে অনিরাময়যোগ্য রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তারপর রয়েছে মশার উপদ্রব। প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।

ঢাকাতে যদি নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি না পায়, ঢাকা যদি পরিচ্ছন্ন ও জঞ্জালমুক্ত উৎকৃষ্ট নগরীর অভিধা না পেয়ে নিকৃষ্ট নগরীর অভিধা পায় তা হলে এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে। বিশ্বের নগরবিষয়ক জরিপে এর আগেও একাধিকবার ঢাকা দ্বিতীয় নিকৃষ্ট নগরীর অভিধা পেয়েছে। যে করেই হোক এ খারাপ অভিধা থেকে আমাদের বের হয়ে

www.facebook.com/tanbir.ebooks

আসতে হবে। ঢাকাকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে, বাড়াতে হবে নাগরিক সুবিধা। দূর করতে হবে জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ। সে জন্য নিতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কার্যকর উদ্যোগ এবং এর কোনো বিকল্প নেই।

০৭ আবাসন সমস্যা : এক মহাচ্যালেঞ্জ

আবাসন সমস্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। গত অর্ধশতাব্দীতে এ ভূখন্ডের জনসংখ্যা বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ জমি রাস্তাঘাট, শিল্প-কলকারখানা ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ বাবদ ব্যবহৃত হয়েছে। আবাসন প্রয়োজনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণও বিশাল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে গত চার দশকে দেশের ফসলি জমির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। বলাই বাহুল্য, এসব জমি ব্যবহৃত হয়েছে বাড়িঘর নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে।

আবাসন সমস্যা দেশের শীর্ষ পর্যায়ের একটি সমস্যা হলেও এর সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ নেই। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আবাসন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ থাকলেও সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা বহুক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক। এ ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব থাকায় আবাসন সমস্যার সুপরিকল্পিত সমাধানের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। অথচ আবাসন সমস্যার সুসমন্বিত সমাধান কার্যত জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।

মানুষের জীবনে তৃতীয় মৌলিক চাহিদা হলো বাসস্থান। আমাদের দেশে আবাসনের চিত্র খুবই দুর্বিষহ। শতকরা ২৭ ভাগ মানুষের নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। শতকরা ৬২ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ বাস করে আধা পাকা বা টিনের ঘরে বা পাটখড়ি ও মাটির দেয়ালের ঘরে কিংবা বস্তিতে। মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ পাকা বাড়িতে বাস করে। বিশ্ব সভ্যতা প্রতিটি মানুষের বাসস্থান প্রাপ্তিকে অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হলো, এ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য সেই অধিকার বাস্তবায়িত হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে গৃহায়ণ সম্ভব হচ্ছে না আমাদের দেশে।

তীব্র আবাসন সংকট বিরাজ করছে ৫৯০ বর্গমাইলের রাজধানীতে। শহরের এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া ভার, যেখানে রাস্তায় বের হলে মানুষের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে না। খোদ রাজধানী ঢাকাতেই বস্তিতে অমানবিক জীবনযাপন করে প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ। সরকারের হিসাব মতে, বাংলাদেশে সাড়ে ১৪ কোটি লোক ৪ লাখ হেক্টর জমিতে বাস করে। এখানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ মাত্র ১৬ শতাংশ। বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা নির্মাণ, শহর সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট এবং শিল্প-কারখানার জন্য বছরে প্রায় ৯৯ লাখ একর আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। একটা শহরের মোট আয়তনের ৪০ শতাংশ রাস্তা থাকা দরকার। ঢাকার ক্ষেত্রে সেটি নেই। ঢাকার বাইরে আয়ের উৎস কম। ঢাকা শুধু অফিস-আদালতের শহর নয়, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। অফিস ভবনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাণিজ্যিক ভবন। এক জায়গাতেই মানুষের ভিড়। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর রাজধানী ঢাকার ৭০ ভাগ মানুষের স্থায়ী কোনো আবাসস্থল বা ঠিকানা নেই। সারাদেশে নিজস্ব আবাসহীন মানুষের সংখ্যা ৫০ ভাগ। বিশ্বে সর্বাধিক আয় বৈষম্যের দেশ বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও

ভয়াবহ হবে। আমরা এখন এক বিস্ফোরণোন্মুখ বোমার ওপর বসবাস করছি। আবাসন সমস্যার সমাধান না হলে দেখা দিতে পারে চরম সামাজিক অসন্তোষ ও গণরোষ।

রাজধানী ঢাকার প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ বসবাস করেন বস্তিতে; যারা গরিব ও নিম্নবিত্ত। মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্তরাও ভালো নেই। তারাও অনেকটা ঝরাপাতার মতো এই নগরীতে ছুটে বেড়ান মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের খোঁজে। এ অবস্থায় সামাজিক আবাসনের দাবি উঠছে সর্বত্র।

প্রধানমন্ত্রী নগরবাসীর আবাসন সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। তিনি গত ১০ মার্চ জাতীয় সংসদকে জানিয়েছিলেন যে, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ঢাকার চারপাশে চারটি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে। রাজউকের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এসব টাউনে সব নাগরিক সুবিধা থাকবে। এছাড়া রাজধানীর তিনটি এলাকায় ৫২ হাজার ৫০০ ফ্ল্যাট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজউক। ৬০০ থেকে ১২০০ বর্গফুটের এসব ফ্ল্যাটের বরাদ্দও দেবে রাজউক। এর মধ্যে রাজধানীর ঝিলমিল প্রকল্পে ১০ হাজার ফ্ল্যাট, উত্তরায় ২২ হাজার ৫০০ এবং পূর্বাচলে ২০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের (ডিসিসি) আয়তন প্রায় ৩৬০ বর্গকিলোমিটার। ডিসিসি'র সর্বশেষ ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকার ২ লাখ ৩১ হাজার ৫৯০টি বাড়িতে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস করে। এসব মানুষের শতকরা ৮০ ভাগের নিজের বাড়ি নেই। এছাড়াও ডিসিসি'র বস্তি উন্নয়ন বিভাগের হিসাবে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ৪ হাজার ৮০০ বস্তিতে বসবাস করে প্রায় ৪৫ লাখ লোক। যা নগরীর মোট জনসংখ্যার ৩৩ দশমিক ৩৩ ভাগ (এক-তৃতীয়াংশ)। এদের অনেকেরই জীবন কেটে যায় রাস্তার পাশে। পুনর্বাসন ছাড়াই অনেক সময় বস্তি উচ্ছেদের শিকার হতে হয় এসব দরিদ্র মানুষকে। ডিসিসি'র এ হিসাবমতে রাজধানী ঢাকার প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৩ হাজার ৩৩৩ জন। সম্প্রতি উইকিপিডিয়ায় বিশ্বের শীর্ষ ঘনবসতিপূর্ণ ৫০টি মেট্রোপলিটন শহরের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ঢাকাকে ৭০ লাখ জনসংখ্যার শহর হিসেবে দেখানো হয়েছে। উইকিপিডিয়ার হিসাবে বিশ্বের শীর্ষ ঘনবসতিপূর্ণ ৫০ শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ৪০তম হলেও ডিসিসি'র সর্বশেষ ২০০৮ সালে রাজধানীতে বসবাসরত জনসংখ্যার ঘনত্বের হিসাবে ঢাকার অবস্থান হবে ষষ্ঠ। কিন্তু বাস্তবে রাজধানীর জনসংখ্যা হবে এর চেয়েও অনেক বেশি।

বর্তমানে ঢাকার যে আবাসন সমস্যা তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। নগর পরিকল্পনাবিদরা তাদের সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে নগর উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ জনসাধারণের মতামত নিয়ে সেটির আলোকে কাজ করা। ভূমি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় করতে হবে। ঢাকার আবাসন সমস্যা নিরসনে কমিউনিটিভিত্তিক আবাসন পল্লী গড়ে তুলতে হবে। এটা করা গেলে সরকারের অন্য বিভাগগুলো ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিটিতে উন্নয়ন কাজও করতে পারবে। ঢাকার বাইরে নাগরিক সুবিধার পরিসর বৃদ্ধি করে মানুষকে শহরের বাইরে বসবাসের সুযোগ দিতে হবে। নাগরিক সেবার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে। সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে কাজ করলে আবাসন সংকট নিরসনসহ নাগরিক দুর্ভোগ কমবে।

ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আশপাশে অনেকগুলো উপশহর গড়ে তোলা সম্ভব হলে শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস পাবে এবং সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্মতভাবে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মেগাসিটির মতো ঢাকাকে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর নগরীতে রূপান্তর সহজতর হবে। জনবহুল বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা অন্যতম জাতীয় সমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে গৃহায়ণ সম্ভব হচ্ছে না বলে দিনে দিনে আবাসিক সমস্যা প্রকটতর হয়ে উঠছে। আবাসন বঞ্চিত মানুষ নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

www.facebook.com/groups/bdbooks

অন্যদিকে শহরগুলোতে গৃহায়ণের সুযোগ কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই একচেটিয়াভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে। সরকার ঢাকার চারপাশে চারটি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তুলতে চাচ্ছে সেখানে অবশ্যই পৌর সুবিধা থাকতে হবে।

ঢাকায় জনগণের চাপ কমাতে আশপাশের শহরগুলোতে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধার উন্নতি ঘটাতে হবে। ঐ শহরগুলোর সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। যাত্রী সুবিধার কথা বিবেচনা করে সেখান অধিক পরিমাণ যাত্রী বহনকারী বাস চালু করার কথা ভাবতে হবে। মেট্রো রেল সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে। প্রতিটি শহরে যদি আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাহলে ঢাকার জনসংখ্যার চাপ কিছুটা কমবে বলে আমার বিশ্বাস। নাগরিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার এ বিষয়ে আন্তরিক হবে এবং আবাসন সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে- এটা শুধু আমার নয় প্রতিটি নাগরিকের দাবি।

আবাসন সমস্যা এখন জাতির জন্য এক মহাচ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে প্রনয়ন করতে হবে জাতীয় আবাসন নীতি। রাজধানীর ওপর চাপ কমাতে বিকেন্দ্রীকরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। ফসলী জমি সুরক্ষা করে স্বল্প জায়গায় অধিক লোকের বসবাস নিশ্চিত করতে নিতে হবে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।

০৮ যানযট ও আমাদের করনীয়

স্কুল জীবনে যানযট বা Traffic jam শিরোনামে Pargraph ও Eassy পড়ার বা লেখার অভিজ্ঞতা নাই এমন লোক বাংলাদেশে খুজে পাওয়া কষ্টকর তাই "যানযট" শব্দটা আমাদের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ যে আজও আমরা শব্দটার সাথে বন্ধুত্ব ছাড়তে পারছিনা, যেন বইয়ের একটি শব্দ বাদ দিলে হয়তো Pargraph বা Eassy লেখার আর কোন বিষয়ই খুজে পাওয়া যাবেনা। আসলে আমাদের অভ্যাসই এমন যে, কেউ দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে না বাঁচিয়ে কখন ঘটল, কিভাবে ঘটল, কেন ঘটল, এভাবে না হলে ঘটতনা, ইস ভাগ্য ভাল যে অমুক জায়গায় লাগে নাই ইত্যাদি সমালোচনা করা আবার আমরা কেউ কেউ ফেসবুক বা মিডিয়ায় প্রকাশ করার জন্য আগে ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকি। মূল কাজের কাজটি কেউই করতে নারাজ। আর হেয়ালি নয় মূল কথায় আসি।

রাস্তায় বের হলেই বিরক্তিকর জ্যামের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠে। সময় মতো অফিসে বা গন্তব্যে যাওয়া, প্রচন্ড গরম সহ্য করা, বাসে ঠাসাঠাসি করে অন্যজনের ঘামের গন্ধ সহ্য করা, পকেটমার এবং মলম পার্টির উপদ্রব, হকার এবং ভিক্ষুকদের চেচামেচি ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যার মূল কারন একমাত্র যানযট। আর এসব জ্যামের বিভিন্ন কারনও রয়েছে যেমন: ভিআইপিদের নিত্য যাওয়া আসা, গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে ফুটওভারব্রিজ না থাকা, সিগন্যালবাতি থাকলেও তার তোয়াক্কা না করা, ট্র্যাফিক পুলিশদের অবহেলা, যখন-তখন বিভিন্ন সরকারী সংস্থাগুলোর রাস্তা খোড়াখুড়ি, রাস্তায় রেজিষ্ট্রেশনবিহীন যানবাহন, যেখানে-সেখানে দাপুটে মালিকদের অবৈধ গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা, ফুটপাতে যত্রতত্র দোকান বসা, রিক্সাওয়ালাদের ওভারটেকিংয়ের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্যামের শহরে আমরা অভ্যস্ত হলেও এই বিরক্তিকর জ্যাম ক্রমশই বিরক্তির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে তা কেউ জানেনা। আমরা শুধু সরকার এবং রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদেরই এ সমস্যার জন্য দায়ী মনে করি। প্রকৃত পক্ষে, এতবড় সমস্যার সমাধান করতে শুধু রাজনৈতিক দল বা সরকারই নয় আমাদের সকলেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমরা মুখ দিয়ে কখনই এই সমস্যার

সমাধান করতে পারবনা। আমাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে হবে। ভাল কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে, সঠিক মনোভাবই এর জন্য যথেষ্ঠ বলে আমি মনে করি, যার জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের। একক প্রচেষ্টায় এবং স্বল্প সময়ে তিনি বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেকাংশেই পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেনা। তাহলে আসুননা আমরা সবাই মিলে দেখি ভাল কিছু করা যায় কিনা?

১. রাজধানীর কাওরান বাজার, মগবাজার, বাংলামোটর, শাহাবাগ, মিরপুর, মৌচাকসহ যে সব জায়গায় ফুট ওভারব্রীজ রয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জনগণ ট্র্যাফিক সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে নিজেরাই সিগন্যাল দিয়ে রাস্তা পার হয় আর ট্র্যাফিক পুলিশদের অসহায়ের মত তাকিয়ে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা। এর ফলে প্রত্যেক জায়গায় ৩/৪ মিনিট রাস্তা বন্ধ থাকলে সারা ঢাকার শহরের প্রতিটি রাস্তায় যানবাহনের লম্বা লাইন তৈরি হয়ে যায় আর এর রেশ কাটাতে না কাটতেই একই পদ্ধতিতে জনগণের রাস্তা পারাপার শুরু হয়ে যায়। এর জন্য দায়ী কে? আমরাই এই সমস্যার তৈরি করে যানযট যানযট বলে চিৎকার করছি আর সরকারকে দায়ী করছি। সুতরাং ফুটওভারব্রীজগুলোর যথাযত ব্যবহার করলে যানযট এবং দুর্ঘটনা দুটোর হাত থেকেই আমরা কিছুটা হলেও রক্ষা পাব। এর ব্যতিক্রম হলে সরকাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. ট্র্যাফিক জ্যামের অন্যতম একটি জায়গা হলো রাস্তার মোড়গুলো। প্রতিটি মোড়ে এসে দেখা যায় মোড়ের মুখের প্রতেকটি রাস্তার যানবাহনগুলো কাছাকাছি এসে আগে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে আর রাস্তার লেন মেইনটেইন করে গাড়ী চালানোর প্রশ্নই ওঠেনা। অথচ মোড়ের অনেক আগেই রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং এবং সিগন্যাল অংকিত আছে। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো ট্র্যাফিক পুলিশদের কাজ কি? তারা যদি এই নিয়মের অবহেলা না করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে অনেকাংশেই যানযট কমানো সম্ভব।

৩. অবাক হলেও সত্য যে, রাজধানীর মহাখালী-ফার্মগেট-শাহাবাগ-প্রেসক্লাব এই রোডটি ছাড়া প্রত্যেকটি ভিআইপি রোডে গেলেই আমরা দেখতে পাই রিক্সার মেলা এবং রিক্সাওয়ালাদের খেয়ালখুশিমত রিক্সা চালানো। প্রায় সময়ই দেখাযায়, পিছনে দ্রুতগতির ট্র্যাক বা বাস আসছে কিন্তু রিক্সাওয়ালারা প্রত্যেকেই মনে করছেন যেন ওনারা ছাড়া ওই জায়গায় পৃথিবীর আর কারও চলার অধিকার নেই আর সাইড দেওয়ারতো প্রশ্নই ওঠেনা। সবাই একমত হবেন যে, ঢাকা শহরের ট্র্যাফিক জ্যামের বেশীরভাগ অংশই তৈরি হয় এই রিক্সাগুলোর জন্য। যানযট নিরসনে অনেক গবেষকগণই বিভিন্ন সময় চেষ্টা করছেন ভিন্ন কোন পথ যেমন মেট্রো রেল, পাতাল রেল বা ঢাকার চারপাশ দিয়ে জলপথ তৈরি করা সবই ভালো উদ্যোগ কিন্তু যা তাৎক্ষনিক কোন সমাধান দিতে পারবেনা। তাহলে আমরা কি শুধু যানযট যানযট বলে চিৎকারই করতে থাকব?

চেষ্টা করে দেখতে দেখিনা যানযট কমিয়ে আনা যায় কিনা? তুলে দেই রাস্তার সকল অবৈধ যানবাহন। তুল দেই রাজধানীর যেসকল রাস্তা ডিভাইডার আছে সেসব রাস্তা থেকে রিক্সাগুলো। তাহলে আমরা চলাফেরা করব কিভাবে? হ্যাঁ, যদি রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দোতলা বাস ব্যবহার করা হয় এবং প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে নির্দিষ্ট স্টপিজ করা হয় তাহলে একদিকে জায়গা কম লাগবে অপরদিকে দিগুণ যাত্রী বহন করা যাবে। সাধারণ বাস বাদ দিয়ে সরকারী উদ্যোগে কাজটি করলে বাসের মালিকদের সাথে একটি সমঝোতা করে দোতলা বাস ব্যবহার করলে ৫০ শতাংশ যানবাহন কম

www.facebook.com/anbir.ebooks

ব্যবহার হবে। সেক্ষেত্রে রাস্তাগুলো অনেকাংশেই ফাঁকা হয়ে যাবে। সাধারণ জনগণ এবং সরকার যৌথভাবে উদ্যোগ নিলে এই পদ্ধতি সবচেয়ে দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে আমার বিশ্বাস।

০৯ পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দর এ পৃথিবী। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, খাল-বিল, গাছপালা ইত্যাদি সবই প্রকৃতির দান। আর বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি মানুষের তৈরি। এছাড়া আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যেমন রয়েছে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরি, বন্যা ইত্যাদির মত নৈসর্গিক শক্তি তেমনি রয়েছে মানুষের তৈরি বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি। কাজেই পৃথিবীর বস্তু, শক্তি ও অবস্থা-এ তিনে মিলে সৃষ্টি হয় মানব জীবনের পরিবেশ।

এসব উপাদানের আনুপাতিক হারের মধ্যে সুস্থ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। এ ভারসাম্য যখন বিঘ্নিত হয় তখনই পরিবেশ দূষিত হয় এবং মানব জীবনের জন্য বিরাট হুমকি ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানব জীবনে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বায়ু। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য নির্মল বায়ু অপরিহার্য কিন্তু বিভিন্নভাবে সে বায়ু সর্বত্র দূষিত হচ্ছে।

প্রথমত, ইট, কাঠ, কয়লা, আবর্জনা পোড়ানোর ফলে যেমন ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি গাড়ি, কল-কারখানায় পেট্রোল, ডিজেল থেকে ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলোর ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ বায়ুকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ইত্যাদি বড় বড় শহরে ও শিল্প এলাকাগুলোতে বায়ু সর্বাপেক্ষা বেশি দূষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ দূষণের আর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অবাধে গাছপালা নিধন। দেশে যত লোকসংখ্যা বাড়ছে ততই বনজঙ্গল কেটে ফেলে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে ও আবাদী জমি বাড়ানো হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেখানে ভূখন্ডের পঁচিশ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে বনাঞ্চল আছে মাত্র ষোল শতাংশ।

তৃতীয়ত, পানি পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। পানির অপর নাম জীবন। বিশুদ্ধ পানি যেমন জীবন ধারণের অবলম্বন তেমনি দূষিত পানি জীবননাশের অন্যতম কারণ। জমিতে কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পানি যেমন দূষিত হয়, তেমনি কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদী ও খালবিলে ফেলার কারণেও পানি দূষিত হয়।

সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপনের ফলে মানুষ নানা প্রকার জটিল ও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। দূষিত বায়ু সেবনের ফলে যেমন যক্ষ্মা, হৃদরোগ ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ হয়,

তেমনি দূষিত পানি পান করার ফলে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি পানিবাহিত রোগ হয়।

এছাড়া বনাঞ্চল কমে যাওয়ার বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, অক্সিজেন কম সরবরাহ হওয়ায় মানুষের জীবনী শক্তি কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় মানুষ মনের আনন্দ ও শক্তি হারিয়ে ফেলছে। এহেন অবস্থা চলতে থাকলে একদিন হয়ত সুন্দর পৃথিবী মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে সারা বিশ্বেই একটা সচেতন মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম পরিবেশ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভূ-পৃষ্ঠে আবহাওয়া দূষণ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশেও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। ধোঁয়া সৃষ্টিকারি জরাজীর্ণ ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহন রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। পরিত্যাজ্য বস্তু আবর্জনাদি, মলমূত্র, পশুপাখির মৃতদেহ যাতে নদী বা খালবিলে ফেলে পানি দূষিত না করতে পারে সেজন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শহরাঞ্চলের ময়লা ও পচা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে সেগুলো মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের কাঁচা পায়খানা ও নালা-নর্দমার মলমূত্র যাতে নদী বা খালবিলের পানিতে না পড়তে পারে সেদিকেও জনগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ ও এগুলো রক্ষণাবেক্ষণসহ বর্তমান বনাঞ্চলকে সংরক্ষণ করতে হবে। শৈশবকাল থেকেই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করার লক্ষে প্রতি বছর পাঁচই জুন বিশ্বের সর্বত্র বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়।

সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ মানব জীবনকে সুন্দর করে। তাই পরিবেশ যাতে সুন্দর থাকে, মানুষের বাসোপযোগী হয় সেদিকে আমাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০ শব্দ দূষণঃ প্রভাব ও প্রতিকার

প্রকৃতি জগতের প্রত্যেক প্রাণীরই তার স্বজাতির সাথে ভাবের আদান-প্রদানের সাধারণ মাধ্যম শব্দ। শব্দ এমন এক প্রকার শক্তি, যা কোন কম্পনশীল বস্তু হতে উৎপন্ন হয়ে জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এসে আমাদের কানে শ্রবনের অনুভূতি জাগায় বা জাগাতে চেষ্টা করে।

কিছু কিছু শব্দ যেমন- পাতার মর্মর ধ্বনি, নদীর কুলু কুলু রব, পাখির কল-কাকলি, গানের সুমধুর সুর আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। পক্ষান্তরে গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের শরীর ও মনে ক্লান্তি নিয়ে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাহলে শব্দ দূষণ কি?

www.facebook.com/tanbir.ebooks

"শব্দের আধিক্য আমাদের শরীর ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাই পরিবেশের শব্দ দূষণ।"

নানা কারণে শব্দ দূষণ হয়ে থাকে। শব্দ দূষণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন কারণসমূহ দায়ী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু-একটি প্রাকৃতিক কারণেও শব্দ দূষণ হয়। মেঘের গর্জন, ঝড়ের সময় বায়ু প্রবাহজনিত তীব্র শব্দ, সমুদ্রের গর্জন, পশুপাখির উচ্চ কণ্ঠধ্বনি যেমন- বাঘের গর্জন, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ, কাকের সমস্বরে কা-কা শব্দ করা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে সাধারণত শব্দ দূষণ ঘটে।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণসমূহঃ

(১) শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ পরিবহণ। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে শহর, নগর, বন্দর, বৃদ্ধির সাথে বাস, ট্রাক, ট্রেন প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব যানবাহনের ইঞ্জিনের শব্দ এবং এগুলোতে ব্যবহৃত উচ্চ মাত্রার হর্নের আওয়াজ শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ।
(২) শিল্প কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্র হতে উৎপন্ন শব্দ, শব্দ দূষণ করে।
(৩) উচ্চ শব্দে রেডিও বা লাউড স্পিকারে গান বাজালে শব্দ দূষণ হয়।
(৪) মাইকের আওয়াজ; যেমনঃ নির্বাচনী প্রচার, বক্তৃতা, ধর্মীয় সভা, লটারীর টিকিট ক্রয়ের আহ্বান ইত্যাদি শব্দ দূষণ করে।

সাধারণ শব্দের তীব্রতা পরিমাপক ডেসিবেল (মানদণ্ড) এবং শব্দ দূষণঃ
শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী সাধারণ শব্দের 'ন্যূনতম তীব্রতা' বা 'প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা' Acoustical Society of America দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। সোসাইটির নির্ধারণ অনুসারে সাধারণ শব্দের শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা হচ্ছে শূন্য ডেসিবেল। সোসাইটি নির্ধারিত এই ডেসিবেল স্কেল তীব্রতা মানের একটি লগ স্কেল। এই স্কেল অনুসারে শব্দের তীব্রতা মাত্রা ০ হতে ১৪০ ডেসিবেলের যে কোনো মাত্রায় কানের শ্রুতিগ্রাহক অঙ্গ 'অর্গান অব কর্টি'র ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতির মাত্রা ডেসিবেল স্কেলের উচ্চতম তীব্রতা মাত্রায় (৭০-১৪০ ডেসিবেল) সর্বাপেক্ষায় বেশি।

এক নজরে মনুষ্য সৃষ্ট শব্দের বিভিন্ন উৎস, শব্দের তীব্রতা এবং শ্রবণেন্দ্রীয়ের উপর প্রভাবঃ

শব্দের উৎস	শব্দের তীব্রতা (ডেসিবেল)	শ্রবণেন্দ্রীয়ের উপর প্রভাব
রকেট উৎক্ষেপণ	১৮০	অস্বস্তিকর বা যন্ত্রণাদায়ক
জেট বিমান	১৪০	
বজ্রপাত	১২০	
রকেট	১১৫	কান ফাটা বা কানে তালা লাগা
কামান	১১০	
এরোপ্লেন বা বয়লার বা ফ্যাক্টরি	১০০	খুব তীব্র শব্দ
পাতাল ট্রেন	৯০	
ব্যস্ত রাস্তা বা শহরে কলকারখানা	৮০	মধ্যম তীব্র শব্দ
রেডিও (খুব জোরে বাজালে)	৭০	
সাধারণ কথাবার্তা	৬০	স্বাভাবিক শব্দ/মৃদু শব্দ

অফিস বা বাসা-বাড়ি ৪০
শান্ত অফিস বা বাসা-বাড়ি ৩০ অতি ক্ষুদ্র শব্দ
ফিসফিস ২০
গাছের পাতা ঝরা ১০ অতি কষ্টে শোনা যায়
শ্রাব্যতা সীমা ০

এবার আসা যাক ডেসিবেল কী?
'বেল' এবং ডেসিবেল হচ্ছে শব্দের তীব্রতা নির্দেশক একক।

শব্দ দূষণের প্রভাবঃ
শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ
১। শ্রুতিযন্ত্রীয় ফলঃ
(ক) হঠাৎ অতি উচ্চ মাত্রার (৭০-১৪০ ডেসিবেল) শব্দের প্রভাবে মানুষের শ্রবণতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন হতে পারে। এমনকি কর্ণপটই ছিঁড়ে যেতে পারে।
(খ) সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা করে ৯০ ডেসিবেল শব্দ মাত্রায় ৩০ বছর ধরে কাজ করে শেষ জীবনে চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার সময় বধিরতা দেখা দেয়।
(গ) সাময়িক ৯০ ডেসিবেল শব্দ মাত্রায় শ্রুতি ক্লান্তি ঘটে। তার সাথে উপসর্গ হিসেবে যোগ হয় কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হতে থাকা।
(ঘ) ১২০-১৫০ ডেসিবেল শব্দ মাত্রায় মানুষ পুরোপুরি বধির হয়ে যায়।
(ঙ) শ্রুতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের শ্রবণশক্তি ১০ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

২। শ্রুতিযন্ত্র বহির্ভুত ফলঃ
(ক) মেজাজ খিটখিটে হয়।
(খ) পড়া-শুনা বা কাজে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায় এবং ভুল সিদ্ধান্তের প্রবণতা বাড়ায়।
(গ) ৫০-৬০ ডেসিবেল শব্দ মাত্রার দূষণ সংলাপ যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অনের সময় শব্দের সংকেত বা সাবধানবাণী সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।
(ঘ) অতি উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণের কারণে মানুষের শ্বসনের হার পরিবর্তিত হয়। ফলে মানুষ শ্বাস কষ্টজনিত রোগে ভোগে।
(ঙ) শব্দ দূষণের ফলে দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়।
(চ) রক্তবাহিকা সংকুচিত হয়ে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে দেয়। ফলে হৃদপেশীর কর্মক্ষমতা করে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে, ত্বক ফ্যাকাসে হয় ও মাংসপেশী উত্তেজনায় কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া ধমনী কাঠিন্যতা প্রাপ্ত হয়ে রক্ত প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায়। এতে হৃদরোগ, খেয়ালপনা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।
(ছ) শব্দ দূষণের ফলে পাকস্থলিতে অম্লতা বেড়ে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটায় এবং আলসারের সৃষ্টি করে।

www.facebook.com/tanbirbooks

(জ) বিমানবন্দর সংলগ্ন অধিবাসী মহিলাদের প্রায়ই ভ্রুণ বিচ্যুতি ঘটে কিংবা কম ওজনের শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।
(ঝ) শব্দ দূষণের কারণে শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।
(ঞ) শব্দ দূষণের প্রভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ফলে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতাযুক্ত কাজে একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়, তাছাড়া মাথা ধরা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণঃ
বিবর্ধিত শব্দের ব্যাপকতায় শব্দ দূষণ বর্তমানে গভীর উদ্বেগের বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরণের চিন্তা ভাবনা করছেন। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১। আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে।
২। হাইড্রোলিক হর্ন নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে।
৩। অনাবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে।
৪। শব্দ অপরিবাহী পর্দার মাধ্যমে।
৫। 'ইয়ার প্লাগ' ব্যবহারের মাধ্যমে।
৬। বোমা বিস্ফোরণ নিষিদ্ধের মাধ্যমে।
৭। ইলেক্ট্রনিক্স দোকানে গান-বাজনা বন্ধের মাধ্যমে।
৮। মিটিং মিছিলে মাইকের ব্যবহার সীমিতকরণের মাধ্যমে।
৯। স্বল্প স্বরে গান শোনা ও টিভি দেখার মাধ্যমে।

সর্বোপরি মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এজন্য স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে হবে।

১০ ঢাকার নদী দূষণঃ হুমকির মুখে সোয়াকোটি মানুষ

বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষেই একদিন গড়ে উঠেছিল এই নগরী। একসময় বুড়িগঙ্গার অপার সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে সবাইকে। কিন্তু কালক্রমে ঢাকা বিস্তৃত হলেও ক্ষয় হয়েছে বুড়িগঙ্গা। নাব্যতা হারিয়ে কমে গেছে পানির প্রবাহ। এখন বুড়িগঙ্গা পরিণত হয়েছে দূষণের নদীতে। আর পরিবেশের এই দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলোর প্রায়

প্রতিটিই মানুষের আক্রমণের শিকার। দখল, ভরাট, আবর্জনা নিক্ষেপ ইত্যাদির কারণে নদীগুলো তাদের গতি ও ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো স্রোতহীন হয়ে আবর্জনার ভাগাড়ে রূপ নিয়েছে। ঢাকা ঘিরে থাকা চার নদী শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু ও বুড়িগঙ্গা প্রায় একই দশায় পড়েছে। এগুলোতে পানির চেয়ে বর্জ্যই বেশি। মাত্রাতিরিক্ত দূষণে এ নদীগুলোর পানিও রং হারিয়ে ফেলেছে। বর্জ্যের মিশ্রণে নদীগুলোর পানি কালো, নীল বা লাল হয়ে গেছে। এ চার নদীকে সরকার 'পরিবেশ সংকটাপন্ন' ঘোষণা করেছে। আর বিশ্বব্যাংক বুড়িগঙ্গাকে অভিহিত করেছে 'মরা নদী' নামে। চামড়া শিল্পের বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। বুড়িগঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য যত কথাই বলা হোক, চামড়া শিল্পকে হাজারীবাগ থেকে সরাতে না পারলে বুড়িগঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব । বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যাসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলো এতটাই দূষিত যে, এসব নদীর পানি এখন শোধনেরও অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কেবল হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো থেকেই প্রতি মাসে গড়ে তিন হাজার মেট্রিক টন কঠিন এবং আড়াই লাখ টন তরল বর্জ্য বুড়িগঙ্গায় পড়ছে। নদীগুলোতে এক সময় প্রচুর মাছ ছিল। অথচ এখন শুধু মাছ নয়, কোনো জলজ প্রাণীই টিকে থাকতে পারছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাজারীবাগের ২০০ ট্যানারি থেকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১০০ টন কঠিন বর্জ্য এবং ২০ হাজার ঘনমিটার পানি প্রায় ত্রিশ ধরনের বিভিন্ন রাসায়নিকের মিশ্রণ নিয়ে দূষণ পদার্থ আকারে বের হচ্ছে এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী ড্রেনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হাজারীবাগের অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমি এবং স্লুইস গেট পেরিয়ে গিয়ে সেগুলো পড়ছে বুড়িগঙ্গা নদীতে।

হাজারীবাগসহ পুরান ঢাকার বাতাস হাইড্রোজেন, সালফাইড, এমোনিয়া, নাইট্রোজেন যৌগের গন্ধে ভারী হয়ে থাকে সবসময়। চামড়া রং করার কাজে ব্যবহৃত রঞ্জকগুলোও মানবস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সদরঘাট এবং এর আশপাশের এলাকার দুই প্রান্তে অনেক দূর পর্যন্ত এখন নদীর পানি কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বাবুবাজার) এলাকায় নদীদূষণের ভয়াবহ দৃশ্য দেখা যায়। সেখানে নর্দমা হয়ে নদীতে যাচ্ছে ঘন ও তরল বর্জ্য। নৌযানে চলাচলের সময় বুড়িগঙ্গার পানির উৎকট গন্ধে নাকে-মুখে রুমালচাপা না দিয়ে চলার উপায় থাকছে না যাত্রীদের।

সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার পানি কুচকুচে কালো। হাজারীবাগে রক্তের মত লাল। তুরাগের পানি কোথাও কালো, কোথাও গাঢ় নীল বর্ণ। টঙ্গীতে বালু নদের পানি ধুসর। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা শহর হারাচ্ছে তার সৌন্দর্য এবং প্রায় সোয়া কোটি অধ্যুষিত এই শহরের মানুষগুলো রয়েছে মারাত্মক স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে।

রাজধানীর ভিতরে-বাইরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ১৮টি ছোট-বড় নদী। এর সবই আজ বিপন্ন। সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে বলা হয় ঢাকার অভ্যন্তরের ৪৩টি খালের সীমানা খাতা কলমে থাকলেও বাস্তবে এদের অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে অস্তিত্ব বাঁচাতে লড়ছে বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা। একদিকে অবৈধ স্থাপনা, অন্যদিকে কলকারখানার দূষিত উপাদান ও সোয়া কোটি নগরবাসীর বর্জ্য নদীর মৃত্যু ঘটাচ্ছে।

বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রতিদিন প্রায় ১৫ লাখ ঘনমিটারেরও বেশি পয়োবর্জ্যের প্রায় সবটাই উন্মুক্ত খাল, নদী, নর্দমা বেয়ে অপরিশোধিত অবস্থায় বুড়িগঙ্গায় এসে পড়ছে। টঙ্গী, বাড্ডা প্রভৃতি অঞ্চলের বর্জ্য চলে যাচ্ছে বালু ও তুরাগে। বুড়িগঙ্গার দূষণমাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নদীর পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না। মাত্রাতিরিক্ত এই দূষণের ফলে রাজধানীর সোয়াকোটি মানুষের স্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। দূষণের ফলে ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় আমাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা যে পরিমাণ পানি সরবরাহ করছে, তার শতকরা ৮৬ ভাগই ভূ-গর্ভস্থ স্তর থেকে তোলা হচ্ছে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতিবছর দুই থেকে তিন মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় নগরবাসীর জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যদিকে নদীর তীর বা আশপাশের বসবাসকারী লোকজন গোসল, রান্নাবান্নাসহ বিভিন্ন কাজে নদীর পানি ব্যবহার করায় ডায়রিয়া, কলেরাসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে।

নদী রক্ষায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দফতরের সমন্বয়ের আবশ্যকতা বোধ করছি। বলাবাহুল্য, নদী দখল ও দূষণ রোধে সরাসরি দায়িত্ব প্রায় ১৫টি মন্ত্রণালয়ের। পরিবেশ অধিদফতরের কাজের আওতায় রয়েছে নদীর পানি দূষণ রোধ করা। বিআইডব্লিউটিএ'র দায়িত্ব তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা। নদীর পানির কর্তৃপক্ষ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, তলদেশের কর্তৃপক্ষ ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পাড়ের মালিক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। সেখানে যে কোনো উন্নয়ন কাজ করতে গেলেই দ্বারস্থ হতে হয় পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের। আর দখলমুক্ত রাখতে প্রয়োজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ের অভাবে নদী দখল এবং দূষণ কোনোটাই রোধ করা যাচ্ছে না। নদীদূষণের পরিণতিতে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও জরুরিভাবে আমলে নেয়ার দাবি রাখে। প্রতিদিন ক্রোমিয়াম, পারদ, ক্লোরিন, নানা ধরনের এসি দস্তা, নিকেল, সিসা, ফসফোজিপসাম, ক্যাডমিয়াম, লোগাম অ্যালকালি মিশ্রিত বর্জ্যের কারণে নদীগুলো প্রায় মাছশূন্য হয়ে গেছে। লাখ লাখ মানুষ পরিবেশ দূষণের শিকার হয়ে জন্ডিস, ডায়রিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মূত্রনালী ও কিডনি, চর্মরোগসহ ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। এসব নদীর পানি ব্যবহারকারী বেশিরভাগ মানুষই চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিকতা সব দিক বিবেচনায় পদক্ষেপ না নিলে দুরূহ পরিণতি যে অবধারিত, তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঢাকার নদী এখন অসুস্থ ও মৃত প্রায় এটার নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে পুনরায় খননের বিকল্প নেই। ঢাকার নদীকে বাঁচাতে সকলকে সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে সরকার আন্তরিক হবে এমনটিই আমার বিশ্বাস।

১১ঘুষ দুর্নীতি উন্নয়ন অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়

দুর্নীতিতে সর্বোচ্চ স্থানটি ছিল বাংলাদেশের। এখন আর বাংলাদেশ সেই অবস্থানে নেই। অনেকটাই উত্তরণ ঘটেছে। এর পরও যা আছে, তাকেও সহনীয় পর্যায় বলার সুযোগ নেই। এখনো ঘুষ দুর্নীতির দুর্বিপাকে আবদ্ধ রয়েছে ১৬ কোটি মানুষের নিয়তি। সরকারের এমন কোনো দপ্তর নেই, যেখানে ঘুষ-উপরির দৌরাত্ম্য নেই। ঘুষ-দুর্নীতির ভূত তাড়াতে জনগণের ট্যাঙে টাকা খরচ করে যাদের পোষা হয়, তাদের ঘাড়েও ভর করেছে আরো বড় ভূত। ফলে ঘুষ দুর্নীতির প্রতিভূদের ঠেকানোর যেন কেউ নেই। হাসপাতালে শিশু জন্মের সময় প্রসূতির ভর্তি ও যন্ত্র-আত্তি থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তির কবরের জায়গা কিনতেও ঘুষের প্রয়োজন হয়। লাশ কাটাতেও ঘুষ দিতে হয় ডোমদের। শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি, হাসপাতালে চিকিৎসা, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চাকরি লাভ, এমনকি মসজিদ-মন্দিরের জন্য সরকারি অর্থের বরাদ্দ নিতে গেলেও ঘুষ দিতে বাধ্য হয় মানুষ। ঘুষ ছাড়া সরকারি দফতরের সেবা মেলে না, এটি যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বেসরকারি ব্যাংক-বীমার চাকরি ও সেবার জন্যও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ঘুষের লেনদেন। বেসরকারি দাতা সংস্থার সহায়তা নিতেও দিতে হয় উপরি। সময়ের সঙ্গে ঘুষ-উৎকোচের লেনদেন সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করছে। দ্রব্যমূল্য বাড়ার অজুহাতে বাড়ছে ঘুষ-উৎকোচের পরিম

১২।রাজধানীতে পানি সংকট

সত্যি সত্যি পানির অপর নাম 'জীবন' হলে বলতে হবে, রাজধানীর মানুষ 'জীবন সংকটে' আছে। এই জীবন নিয়ে ভয়াবহ ভোগান্তি পোহাচ্ছে রাজধানীবাসী। কিছুদিন ধরে রাজধানীর প্রায় সর্বত্রই ওয়াসার পানি দুর্গন্ধময়। এ পানির সঙ্গে ময়লা-আবর্জনা ছাড়াও বিভিন্ন রোগজীবাণুর ছড়াছড়ি। বাধ্য হয়ে এ দূষিত ও বিষাক্ত পানিই ব্যবহার করতে হচ্ছে নগরবাসীকে। এতে একদিকে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। নানাবিধ কারণেই পানির নাম হয়েছে জীবন। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জীবন ধারণে পানির প্রয়োজন। খাওয়া, গোসল, রান্না, কাপড় ধোয়া, টয়লেট ব্যবহার, বাগান, কনস্ট্রাকশনসহ জনজীবনের নানা কাজে পানির ব্যবহার অবধারিত। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, ওয়াসার পানি ব্যবহার অযোগ্য। ট্যাপ খুললেই বেরিয়ে আসছে ফেনা আর ময়লাযুক্ত পানি। ওয়াসা ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দাদের পানির নামে যা সরবরাহ করছে তা নানা বর্ণের, নানা গন্ধের এবং নানা স্বাদেরও। পান করা দূরে থাক, এই পানিতে গোসল, রান্না এবং হাত-মুখ ধোয়ার কাজও ঝুঁকিপূর্ণ। ফুটালেও দুর্গন্ধ দূর হয় না। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের এ পানিই একমাত্র ভরসা। তারা বাধ্য হয়ে এই পানি ব্যবহার করছে। বিশেষ করে লালবাগ, মগবাজার, মুগদা, মাণ্ডা, মানিকনগর, টিকাটুলী, অভয় দাস লেন, গোপীবাগ, চকবাজার, নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ, স্বামীবাগ, সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, সায়েদাবাদ, চানখাঁরপুল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এলাকা, হোসনি দালান রোড, জিন্দাবাহার লেন, নাজিরা বাজার, সিদ্দিক বাজার, উর্দু রোড, পাকিস্তান মাঠ, নয়াবাজার, বংশাল, নাজিমুদ্দীন রোড, আরমানিটোলা, বনগ্রাম লেন, ওয়ারী, টিপু সুলতান রোড, ধোলাইখাল, নবাবপুর, ধূপখোলা, গেণ্ডারিয়া, ফরিদাবাদ, জুরাইন, পোস্তগোলা, যাত্রাবাড়ী, খিলগাঁও, বাসাবো, কমলাপুর, গোড়ান, রামপুরা এলাকার বাসিন্দারা খাওয়ার পানির চরম সংকট সইছে।

১৩।ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা

বদলে যাচ্ছে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহর পর্যায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। হয়েছে নতুন নতুন রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, সেতুর সঙ্গে উড়াল সেতু।

এতে সহজ হয়ে আসছে গণমানুষের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা। কমেছে সময়ের অপচয়। চলতি বছরে শুরু হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চার লেনের ফ্লাইওভার এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম চারলেনের সড়কসহ বেশ প্রকল্প।

যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সূত্র জানায়, যানজট কমিয়ে দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চার লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিপুল পরিমাণ যানবাহন ভুলতা বাজার এলাকা দিয়ে চলাচলের কারণে এ এলাকায় প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পূর্বাচল নতুন শহরে যাতায়াতের ফলে ভবিষ্যতে যানজট আরও বৃদ্ধি পাবে

www.facebook.com/tanbir.ebooks

বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ভুলতায় একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন আনতে ৯২৮ কোটি টাকার মেট্রোরেল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। পদ্মা সেতু জনগণের স্বপ্নের সেতু। জুনে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। এছাড়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি টানেল, কালনা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা-চট্টগ্রাম চারলেন সড়ক নির্মাণ কাজ এ সরকারের আমলে শেষ হবে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ আগামী অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে শেষ হবে বলে জানান মন্ত্রী।

এর সুফল পেতে শুরু করেছে ঢাকাবাসীও। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের সুফলও পেতে শুরু করেছে ঢাকাবাসী। এর ফলে সায়েদাবাদের ধুলার আঁধারে যানজটে বসে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। সায়েদাবাদ থেকে যাত্রাবাড়ী যেতেই বসে থাকতে হতো ঘন্টার পর ঘন্টা। এমনকি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যেতে যে সময় লাগে, এর চেয়েও বেশি সময় লাগত গুলিস্তান থেকে চিটাগাং রোড পর্যন্ত যেতে। এখন আর সে যন্ত্রণা নেই।

এখন গুলিস্তান থেকে কুতুবখালী টোল প্লাজায় যেতে লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট। পলাশী থেকে কুতুবখালী যেতে ১০ মিনিট আর সায়েদাবাদ থেকে কুতুবখালী পাঁচ বা সাত মিনিট। ফলে ঢাকা-মাওয়া রোডের যানজটও কমে এসেছে। সেই সঙ্গে অসহনীয় দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে চট্টগ্রামগামী মানুষ।

এদিকে কুড়িল ও এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার দুটি সময়ের দূরত্ব কমিয়েছে। এখন আর সিগন্যালে বসে অস্বস্তির প্রহর গুনতে হয় না। এয়ারপোর্ট, ভাসানটেক, বারিধারা, অথবা বনানী রেলগেটে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা বা কুড়িল রেলগেটে এসে লম্বা লাইনের দিনও শেষ।

কুড়িল ও এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার এবং বনানী ওভারপাস হওয়ার আগে এখানে ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের বেশি লেগে যেত। ফ্লাইওভার দুটি সময়ের দূরত্ব কমানোর পাশাপাশি সহজ করেছে পথচলা। এখন সিগন্যালে বসে ট্রাফিক পুলিশের হাতের ইশারার প্রহর গুনতে হয় না। বনানী সিগন্যাল পার হলে এক টানেই চলে আসা যায় জিয়া কলোনি।

আর সেখান থেকে আর্মি গলফ ক্লাব এলেই পৌঁছানো যাচ্ছে কুড়িল, এয়ারপোর্ট। ভাসানটেক অথবা বারিধারা।
বনানী রেলগেটে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা বা কুড়িল রেলগেটে এসে লম্বা লাইনে অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে গেছে এ দুটি ফ্লাইওভারের বদৌলতে। মানুষের জীবনকে করেছে সহজ। সময় বাঁচিয়েছে অনেক। এর সঙ্গে বাড়তি সুবিধা যোগ করেছে বনানী রেলগেটের ওপর নির্মিত ওভারপাসটি। এটির কারণে আর রেলগেটের সিগন্যালে বসে থাকতে হয় না। এমনকি রেলগেটের কাছে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না।

আগে গাজীপুর, টঙ্গী বা এয়ারপোর্ট এলাকায় আসা রামপুরা বা যাত্রাবাড়ীর বাসগুলো দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত। এমনকি একটি ট্রেন যাওয়ার পর আরেকটির জন্য অপেক্ষা করতে হতো একই সিগন্যালে। গাড়ির দীর্ঘ সারি খিলক্ষেত এলাকাও ছাড়িয়ে যেত।

একই অবস্থা চোখে পড়ত মহাখালী ফ্লাইওভারে। জাহাঙ্গীর গেট এলে নিমিষেই চলে আসা যায় বনানী। তবে মাঝেমধ্যে বনানী-কাকলী সিগন্যালের গাড়ির জট ভোগান্তিতে ফেলে মানুষকে। তখন মহাখালী ফ্লাইওভারের ওপর গাড়ির দীর্ঘ সারি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে এখন এ দৃশ্য তেমন চোখে পড়ে না। হঠাৎ কোনো সমস্যা না হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না।

খিলগাঁও রেলগেটে এখন আর বাসের জটলা থাকে না। তবে অব্যবস্থাপনা আর ট্রাফিক আইন মেনে না চলায় হিউম্যানহলার ও রিকশার জট লেগেই থাকে। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টার আটকে থাকার অভিজ্ঞতা পুরনো দিনের। এখানকার রিকশাজট এখন সহনীয়। রাজারবাগ থেকে বাসাবো, রাজারবাগ থেকে মালিবাগ অথবা মালিবাগ থেকে কমলাপুর রেলগেট যেতে মাত্র কয়েক মিনিটের প্রয়োজন। এখানেও সময়ের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে খিলগাঁও ফ্লাইওভারটি।

১৪। ঢাকা শহরের যোগাযোগ ভাবনাঃ মেট্রোরেল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ঢাকা শহরের যানজট হ্রাস ও গণপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়তনকে সামনে রেখে গত ১৯ শে ডিসেম্বর প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার মেট্রোরেল প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। টাকার অংকে পদ্মা ব্রীজের প্রাক্কলিত বাজেটের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকল্প হতে যাচ্ছে এটি। আমরা আশা করছি এই প্রকল্প ঢাকার দুঃসহ যানজট কমাতে সাহায্য করবে। তিনটি পর্যায়ে ২০২২ সালে শেষ হলে এটি প্রতি ঘন্টায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে যা রাস্তায় অন্যান্য যানবাহনের উপর চাপ কমাতে সাহায্য করবে। সংখ্যাটি তাত্বিকভাবে সত্য কিন্তু ঢাকা শহর এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে শুধুমাত্র একটি বা দুটি রুটে যানজট কমিয়ে পুরো শহর নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। ঢাকায় এখন বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ও কার্যকর বিজনেস হাব (Central Business District) রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়, এর আগে ও পরে আশেপাশের ভূমির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে তা অনুমান করা যায়। অপরদিকে শুধু পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব মতেই প্রতিবছর ঢাকার জনসংখ্যা ৫ লাখ এর বেশী করে বৃদ্ধি পাবে, সাথে সাথে বাড়বে বিভিন্ন কাজে প্রতিদিন ঢাকায় যাওয়া-আসা লোকের সংখ্যা। যদি ধরেও নিই মেট্রোরেল প্রকল্প শেষ হলে ঢাকার যানজট আর থাকবে না, বর্তমান বা ২০২২ সাল পর্যন্ত যানজট মোকাবিলা ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন নিকট ও দূর ভবিষ্যত বিবেচনায় একান্তভাবে জরুরী।

শহরের যোগাযোগব্যবস্থা পরিচালনায় দুটি উপায় সবখানে ব্যবহৃত হয়- ভৌত অবকাঠামো যেমন রাস্তা, ফুটপাত, যোগাযোগ মাধ্যম, ট্রাফিক ব্যবস্থার নকশা ও নির্মাণ (Design Measures) এবং অন্যটি হলো নিয়ম-কানুনের (Regulatory Measures) প্রয়োগ যা আমাদের শহর পরিকল্পনায় সবসময় উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এদুটির সমন্বয় না হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা তার কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বাস্তবায়নে আর্থিক প্রয়োজন খুবই সামান্য এবং সরকার ও জনসাধারণের মিলিত ইচ্ছাই এখানে প্রধান। ঢাকা শহরের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় উপরোক্ত দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে কিছু স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা উত্থাপন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

ভৌত পরিকল্পনাঃ

ঢাকা শহরের আয়তন অনুসারে যে পরিমাণ রাস্তা থাকার কথা আছে তার ৫০ শতাংশেরও কম। নতুন রাস্তা তৈরীর সুযোগও কম। তাছাড়া নতুন রাস্তা নতুন চাহিদাও তৈরী করে। আর টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হল নূন্যতম সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফলাফল বের করে নেওয়া। সরকার নতুন রাস্তা না করে যা করতে পারেঃ

১। কৌশলগত যোগাযোগ পরিকল্পনা ২০০৫ (Strategic Transport Plan) অনুসারে প্রধান কয়েকটি রুটে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (Bus Rapid Transit) এবং এর সাথে সাথে মিনিবাস ও গণপরিবহনে ব্যবহৃত অন্যান্য ছোটযানের পরিবর্তে শহরে চলাচল উপযোগী বড় ও দোতলা বাস চালু করা। এখানে ব্রাজিলের দক্ষিণের শহর কিউরিতিবা'র বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের উদাহরণ দেওয়া খুবই যুক্তিসংগত। ১৯৭১ সালে, নতুন নির্বাচিত মেয়র Jaime Lerner যিনি নিজে একজন নগরপরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি- অতিরিক্ত প্রাইভেট কারের পরিবর্তে গণপরিবহনের মাধ্যমে শহরকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেন। আজ ৩০ লক্ষ লোকের শহরে প্রতিদিন ৭০ শতাংশ মানুষ গণপরিবহন ব্যবহার করছে। এই শহরে আছে ১৫০ কিমি সাইকেল লেন। কিউরিতিবা'র বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রতিদিন ২৫ লক্ষ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম। পুরো প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে হয়েছে এবং এখনও কোন ভর্তুকি দিতে হয় না। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে শতকরা ৯৯ ভাগ নগরবাসী তাদের শহর নিয়ে গর্বিত। দীর্ঘ ২২ বছর এক টানা মেয়রের দ্বায়ীত্ব পালনের পর Lerner রাজনীতি থেকে অবসর নেন এবং এখন বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন।

২। বিদ্যমান সড়ক গুলোতেই বাসের জন্য একটি আলাদা লেন এবং ট্রাফিক সিস্টেমে কিছু পরিবর্তন করে গণপরিবহন মাধ্যমকে আরও দ্রুতগামী করানো যায়। যেখানে সংযোগ সড়ক দুয়ের অধিক নয় সেখানে প্রাইভেট কার ও অন্যান্য গাড়ী সিগন্যাল এ দাঁড়াবে আর পাশের বাস লেন দিয়ে বাস চলে যাবে। এতে করে একদিকে বাস চলাচল দ্রুততর হবে অন্যদিকে বেশী সময় লাগার ফলে প্রাইভেট কার চলাচল নিরুৎসাহিত হবে।

৩। বাসের দরজা একটি হুইল চেয়ার ঢোকার মত প্রশস্ত হবে এবং দরজা ও বাস স্টপেজ এর উচ্চতা একই হবে যাতে শিশু-বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সহজে উঠতে পারে। বাসে ড্রাইভারের পিছনে কিছু অংশ ফাঁকা রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

৪। ফুটপাতগুলো দখল মুক্ত করে পথচারী চলাচলের উপযোগী করতে হবে। এর উপকারীতা বহমুখী। যেমন দিনের ব্যস্ত সময়ে ফার্মগেট থেকে কাওরানবাজার পর্যন্ত বাসে যেতে ১০-১৫ মিনিট লাগে। অথচ হেঁটে গেলে এর চেয়ে কম সময়ই লাগবে। ফুটপাতগুলো সংস্কারের ফলে স্বল্প দূরত্বে বাস বা রিকশার ব্যবহার কমবে। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সপ্তাহের দিন অনুসারে রেশনিং অথবা সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।

৫। বিশ্বের বড় বড় শহর গুলোতে হাজারো যানবাহনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে যা চোখে পড়ে তাহল সাইকেলের ব্যবহার। বেশীরভাগ জনসমাগমের জায়গায় সাইকেল রাখার আলাদা জায়গা রয়েছে এবং ভাড়ায় সাইকেল পাওয়া যায়। ঢাকা শহরে যদি আলাদা সাইকেল লেন করা যায় তাহলে লক্ষ লক্ষ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও নবীন চাকুরীজীবীদের সহজেই আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

৬। সাভার, আমিনবাজার হয়ে প্রচুর পণ্যবাহী ট্রাক পুরো শহরের ভিতর দিয়ে যাত্রাবাড়ি বা পুরান ঢাকার আড়তগুলোতে যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে আমিনবাজার হতে নৌপ থে পণ্য আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে যাত্রী পরিবহনের জন্য মহা ধুমধামে শুরু হওয়া সি-ট্রাক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লোকবল ও তদারকির অভাবে এখন বন্ধপ্রায়। এদিকেও প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত আশু কাম্য।

৭। শহরের বিভিন্ন প্রবেশ মুখে বিনামূল্যে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখা যাতে করে মানুষ সেখান থেকে গণপরিবহন ব্যবহার করে কর্মস্থলে আসতে পারে। কল্যাণপুর, বনানী, সায়েদাবাদ এরকম কয়েকটি জায়গা হতে পারে।

ভৌত অবকাঠামো ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক। বাংলাদেশে কোন সরকারকেই এ বিষয়ে খুব বেশী আন্তরিকভাবে কাজ করতে দেখা যায় নি। আবার এখানে সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণেরওএকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনস্বার্থে প্রণীত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সরকারের কাজে সাহায্য করা প্রতিটি সাধারণ নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারেঃ

১। মেট্রোপলিটান এলাকার ভিতর চলাচলকৃত ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ীর জন্য মাসিক বা বাৎসরিক টোল এবং নির্দিষ্ট সময়ের বেশী অবস্থানকারী গাড়ীর বিপরীতে পার্কিং মাশুল আদায় করা যেতে পারে যা পরবর্তীতে রাস্তার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ হবে। ছোট গাড়ী আমদানি নিরুৎসাহিত করতে হবে।

২। ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ীর নম্বর প্লেট অনুসারে সপ্তাহের একটি দিন ব্যবহার থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

৩। ট্রাফিক পুলিশের আধুনিকিকরণ ও যথাযথ ক্ষমতায়ন এবং ট্রাফিক আইন অমান্যকারীকে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধনে যথাশীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু করা দরকার।

৪। সর্বশেষ, কিন্তু আমার মতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো চালকদের ট্রাফিক আইন ও গাড়ী চালনা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। লক্ষ মানুষের জীবন যার হাতে তাকে আমাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেই হবে।

শহর পরিকল্পনায় ভূমির ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঠিক ভূমি ব্যবস্থাপনার দ্বারা মানুষের যাতায়াতের ধরণ ও পরিমাণ অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন স্থাপনা অনুমোদনের আগে আশেপাশের এলাকায় এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ধারণা ও তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ণ ও প্রয়োগের দ্বায়ীত্ব নগর পরিকল্পনাবিদের তত্বাবধানে থাকা বাঞ্চনীয়। প্রয়োজনে কিছু শর্ত যেমনঃ ডেভেলপার কর্তৃক বেজমেন্ট পার্কিং, ফুটপাথ সংস্কার, ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ বা নির্মাণ পরবর্তী শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয় বিধিমালা অন্তর্ভুক্ত করা।

উন্নত বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ নগরে বসবাস করলেও বর্তমান সময়ে উন্নয়নশীল দেশে নগরায়নের হার খুব দ্রুত এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা ঘটছে। সেই তুলনায় নগর সুবিধা অপ্রতুল। আমাদের সচেতনতাই পারে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য সুন্দর দেশ রেখে যেতে। আমাদের মনে রাখতে হবে শহর হলো মানুষের জন্য, মানুষের

www.facebook.com/tanvir.ebooks

তৈরী কৃত্রিম একটি পরিক্ষণক্ষেত্র যেখানে পরিস্থিতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলব্ধ অনুমানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত কাজের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই হবে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

১৫ পর্যটন শিল্প ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। নতুন করে কৌশল ঠিক করে সম্ভাবনার সবটুকুকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পর্যটনে মডেল হতে পারে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ স্বল্প আয়তনের দেশ হলেও বিদ্যমান পর্যটক আকর্ষণে যে বৈচিত্র্য তা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। পৃথিবীতে পর্যটন শিল্প আজ বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটন শিল্প বিকাশের ওপর বাংলাদেশের অনেকখানি সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে কর্মসংস্থান ঘটবে ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সফল হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও শিল্প, সাহিত্য, কালচার ও প্রথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐতিহাসিক স্থান দেখার জন্যও পর্যটকরা নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছুটে চলে প্রতিনিয়ত। পর্যটন হলো একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প, এ শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি অনুদান ও সংশিল্লষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি উন্নত অবকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা দরকার পর্যটনের জন্য। পর্যটন শিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রগুলো দেশ-বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অধিকতর বিকাশ ঘটানো। ২০১৩ সালে পর্যটন খাতে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও ৪ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। সে হিসাবে ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাতের অবদান দাঁড়াবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর, যেমন_ পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যে কোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি।

বর্তমানে বাংলাদেশে উলেল্লখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো দূষণের শিকার। দেশে প্রয়োজনীয় পর্যটন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের সমুদ্রসৈকত সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থা না থাকায় জাহাজ ভ্রমণকালে পর্যটকরা তাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমুদ্রে ফেলে পরিবেশ দূষণ করছে। প্রবালের ফাঁকে এসব দ্রব্য জমে এক ধরনের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কোরালের ওপর বালুর আস্তর জমে যাচ্ছে। অনেকে কোরাল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। একই অবস্থা রাঙামাটির সুভলং ঝরনা, বান্দরবানের শৈলপ্রপাত এবং বগা লেকে বিদ্যমান। জলার বন রাতারগুলকে নিঃশেষ করার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনও রক্ষা পায়নি অবকাঠামো বিশেষজ্ঞদের হাত থেকে। সুন্দরবনের রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের আয়োজন চলছে পুরোদমে।

বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন শিল্প বিকাশের কারণে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে নিজস্ব কৃষ্টি ম্রিয়মাণ হতে চলেছে। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনগণকে পর্যটকদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। পর্যটকরা আদিবাসী তথা স্থানীয় ঐতিহ্য দেখে অবজ্ঞা করে। তবে অপরিসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশবান্ধব নীতিমালা আর বিদেশিদের

জন্য বিশেষ এলাকা গড়ে না তোলায় দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না পর্যটন শিল্প। তাই জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বাড়াতে, বাজেটে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর উপযুক্ত পর্যটন নীতি প্রণয়নের আশা পোষণ করছি।

১৬বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনা

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ বাংলাদেশ। সবুজে ঢাকা আঁকাবাঁকা পাহাড় ও নীল পানিতে দিগন্তছোঁয়া অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের সবটুকুতেই মুগ্ধ দেশি-বিদেশি ভ্রমণপিপাসুরা। তাই বলা যায়, পর্যটনশিল্পে অপার সম্ভাবনা রয়েছে এ দেশে।

অপার সম্ভাবনা

নতুন কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন দেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও শিল্প, সাহিত্য, কালচার ও প্রথায় সম্পর্কযুক্ত ঐতিহাসিক স্থান অবলোকনের জন্যও পর্যটকরা নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছুটে চলেন প্রতিনিয়ত। সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। স্বল্প আয়তনের জনবহুল দেশ হলেও বিদ্যমান পর্যটক আকর্ষণে যে বৈচিত্র্য, তা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। তাই এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত। বাংলাদেশের পর্যটনের আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক মসজিদ ও মিনার, পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত, পাহাড়, অরণ্য ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া দেশের প্রতিটি এলাকা বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত। রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার সিবিচ। আমাদের দেশের উন্নয়নে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত হতে পারে আশীর্বাদ। এ জন্য দেশি বিনিয়োগই শুধু নয়, প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা সরকারের উঁচু স্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত। তবুও রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। সুন্দরবন ও কক্সবাজার পর্যটনশিল্প বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক নিদর্শন-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের বিজ্ঞাপন হতে পারে। এখান থেকে সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করতে পারে।

পর্যটনশিল্প হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকা-ের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে জায়গা করে নেওয়াসহ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজস্ব খাতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে আগের তুলনায় বিভিন্ন পর্যটক আকর্ষণীয় স্থানে ভ্রমণের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এই শিল্পের কর্মকা- দেশের আনাচে-কানাচে চলায় গ্রামীণ মানুষেরই বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই এ শিল্পের সুফল গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে আয়ের সমতা সৃষ্টিতেও সহায়ক। যেহেতু বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, সেহেতু পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ঘটলে বাংলাদেশের মানুষের, বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। পর্যটনশিল্প বিকাশের ওপর বাংলাদেশের অনেকখানি সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। সরকারি অনুদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি উন্নত অবকাঠামো, সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা দরকার পর্যটনের জন্য। পর্যটনশিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রগুলো দেশে-বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এর অধিকতর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। পর্যটনশিল্প দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, সম্পদের গতিশীলতা আনে, অর্থনীতিতে আয়-গুণকের প্রভাব সৃষ্টি করে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের উন্নয়নে সাহায্য করে। এ শিল্প গন্তব্য দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, শিক্ষার অগ্রগতি এবং শান্তি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষের মূল্যবোধ, আচরণ, জীবনধারা, প্রকাশভঙ্গি, গোষ্ঠী-সংগঠন ইত্যাদি সমৃদ্ধ হয়। পর্যটনশিল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য ‘লাইফ ব্লাড’ হিসেবে কাজ করে ওইসব দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। অধিকন্তু পর্যটন কর্মকা- মানুষের জন্য আনন্দের জোগান দেয়, দৈনন্দিন জীবনে কিছু সময়ের জন্য হলেও স্বস্তি আনে এবং অবকাশযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। পর্যটনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে জানতে পারে, দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পর্যটকরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক-সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রতিটি পর্যটন গন্তব্যের সরকার ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা এ শিল্পটিকে বিশেষ গুরুত্বদান করে এর উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পর্যটন মানুষের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ নতুন কিছু দেখতে এবং নতুন স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। নতুন

অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে বলে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে দেশ সমৃদ্ধ হলে মানুষের ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও জীবনমান উন্নত হয়। পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন গন্তব্য দেশের মানুষের এবং পর্যটকদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করে। মানুষ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে একে অপরকে জানতে পারে। এভাবে একজন অন্যজনের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে নিজ নিজ আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি, জীবন পদ্ধতি, মূল্যবোধ, মনোভাব ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন এনে পরস্পর সমৃদ্ধ হতে পারে। পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন লক্ষ্য করে প্রতিটি দেশই নিজ নিজ ঐতিহাসিক স্থাপনার সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক চর্চার উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিতে মনোনিবেশ করে। এছাড়া মানুষের মধ্যে যে বন্ধন ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়Ñ এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যও বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বজুড়ে পর্যটনশিল্প

পর্যটন আজ বিশ্বের বৃহত্তম ব্যবসা। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের মতে, বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্প হলো পর্যটন। সারা বিশ্বে কর্মসংস্থানের দিক থেকে এ শিল্পই সবচেয়ে এগিয়েÑ প্রায় ১১ শতাংশ। টুরিস্ট গাইড, হোটেল ব্যবস্থাপনা, রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপনা, রান্নাশিল্প, দোভাষী, পরিবহন ব্যবস্থাপনাÑ এ রকম অনেক কাজ পর্যটনশিল্পের মধ্যে পড়ে। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাপী পর্যটনশিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে ১ হাজার ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ বেশি। বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদনে এ শিল্পের অবদান প্রায় ৫ হাজার ৯৯১ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার। এটি মোট বিশ্ব উৎপাদনের প্রায় ৯ দশমিক ১ শতাংশ। পর্যটনশিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর যেমনÑ পরিবহন, হোটেল-মোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, এয়ারলাইনস ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে। তা অন্য যে কোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে বেশি। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস পর্যটনশিল্প। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ২০২০ সালনাগাদ পর্যটন থেকে প্রতি বছর ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হবে। এই শিল্পে দক্ষ ও অদক্ষÑ উভয় শ্রমিকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দিক থেকেও সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে স্থান দখল করে নিয়েছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রেও অন্যান্য শিল্পের চেয়ে পর্যটন খাতের অগ্রগতি প্রায় দেড়গুণ বেশি।

পর্যটনশিল্পে আমাদের অবস্থান

বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটনশিল্পের জন্ম হয়। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই পার হয়ে দেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটে। মূলত ৪টি বিষয়ে বেসরকারিভাবে পর্যটনশিল্পের এ বিকাশ সফল হয়েছে বলা যায়। এগুলো হলো আতিথেয়তার জন্য হোটেল-ওরস্টুরেন্ট, থাকার জন্য রিসোর্ট, থিমপার্ক ও যাতায়াতে ট্রান্সপোর্ট সুবিধা। পর্যটন সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা গড়ে ৫০ লাখ। ২০১২ সালে মোট জিডিপির ৪ দশমিক ৩ শতাংশ এসেছে পর্যটন খাত থেকে। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৩৯ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। এটি ২০১৩ সালে বেড়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হয়। ২০২৩ সালনাগাদ গড়ে তা ৬ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়াবে। টাকার অঙ্কে এটি প্রায় ৮১ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। ২০১২ সালে পর্যটন খাত থেকে যে পরিমাণ টাকা এসেছে, এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রায় ১৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকা এসেছে অভ্যন্তরীণ পর্যটন খাত থেকে। এটি মোট জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ। এছাড়া শুধু ২০১২ সালেই পর্যটন খাতের সঙ্গে জড়িত ছিল ১২ লাখ ৮১ হাজার ৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী। তা মোট চাকরি খাতের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। এটি ২০১৩ সালে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। এ বছর পর্যটন খাতে ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২০১৪ সালে এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে ৪ শতাংশ। ২০১৪ থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। এই হিসাবে ২০২৪ সালে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে পর্যটন খাতের অবদান দাঁড়াবে ১ দশমিক ৯ শতাংশ।

পর্যটনশিল্পের সমস্যা

অপরিসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশবান্ধব নীতিমালা ও বিদেশিদের জন্য বিশেষ এলাকা গড়ে না তোলায় দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না পর্যটনশিল্প। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন পর্যটন খাত থেকে প্রচুর অর্থ আয় করছে, তখন কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাচ্ছে না বাংলাদেশ। এখানকার যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অসুবিধা ছাড়াও চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। এছাড়া পর্যটনশিল্পের প্রচার-প্রসারের জন্য সরকারি ও বেসরকারিÑ উভয়ের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন পর্যটন স্পটে পর্যটকরা ছিনতাইসহ বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, বিশেষত নারী ও বিদেশি পর্যটকরা বেশি সমস্যায় পড়েন। দিনে ফেরিওয়ালাদের উৎপাত ছাড়াও পর্যটন স্পটে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের কারণে পর্যটকরা অনুৎসাহিত হন। বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন কাউন্সিলের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৩ সালে জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের অবদান যেখানে সিঙ্গাপুরে ৭৫ শতাংশ, তাইওয়ান,

হংকং, ফিলিপিন্সে ৫০ শতাংশের বেশি, মালদ্বীপের অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই আসে পর্যটন খাত থেকে৷ সেখানে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান মাত্র ২ দশমিক ১০ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো দূষণের শিকার। দেশে প্রয়োজনীয় পর্যটন বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সুন্দরবনের সমুদ্রসৈকত সবচেয়ে বেশি দূষণের শিকার। সুষ্ঠু বর্জ্যব্যবস্থা না থাকায় জাহাজে ভ্রমণকালে পর্যটকরা ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সমুদ্রে ফেলে পরিবেশ দূষণ করছেন। প্রবালের ফাঁকে এসব দ্রব্য জমে এক ধরনের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কোরালের ওপর বালুর আস্তর জমে যাচ্ছে। অনেকে কোরাল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। একই অবস্থা রাঙামাটির সুভলং ঝরনা, বান্দরবনের শৈলপ্রপাত ও বগা লেকে বিদ্যমান। জলার বন রাতারগুল নিঃশেষ করার কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনও রয়েছে অস্তিত্বে হুমকির মুখে। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হলো, বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনশিল্প বিকাশের কারণে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে নিজস্ব কৃষ্টি ম্রিয়মাণ হতে চলেছে। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনগণকে পর্যটকদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। পর্যটকরা আদিবাসী তথা স্থানীয় ঐতিহ্য দেখে অবজ্ঞা করে। তবে অপরিসীম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশবান্ধব নীতিমালা ও বিদেশিদের জন্য বিশেষ এলাকা গড়ে না তোলায় দেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না পর্যটনশিল্প।
পরিশেষে এটাই বলা যায়, সব সম্ভাবনা ও সম্পদ ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পর্যটনে মডেল হতে পারে।

১৭ উন্নয়নের প্রধান শর্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এটাই এখনকার বাস্তবতা। তবে উন্নত দেশে পরিণত হতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজনীতি ও অর্থনীতি একটি অন্যটির অনুষঙ্গ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এ মুহূর্তে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। তবে এই উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে হলে, এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় এ উন্নয়নকে টেকসই করা যায় সেটাই আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের যে মূলধন আছে তা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এটি কেউ মেনে নিতে না পারলেও সত্য হচ্ছে- বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য, সুশাসন, রাজনৈতিক অস্থিরতা একটা বড় বাধা। মধ্যম আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশের সামনে রাজনৈতিক পলিসি, আইন ও ব্যবসায় উৎসাহের মতো তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ছাড়া মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পলিসির ফলে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসছে না। ভারসাম্য ও স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পলিসি বড় বাধা। এ থেকে উত্তরণে নজর দিতে হবে। আইনের শাসন না থাকলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে উন্নয়ন ও অর্থনীতি মুক্তি পায় না। এছাড়া ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে উৎসাহ না পেলে যে কোন দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্র বড় হয় না। তৈরি হয় না অর্থনীতির ঢালপালা।

আগেই বলেছি বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা আছে তাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। আর এটা করা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। অর্থনীতির গতিধারা ধরে রাখতে বিভিন্ন সেক্টরের সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ অব্যাহত রাখা উচিত। এর ফলে সরকারও লাভবান হবে।

সামপ্রতিক সময়ে আমাদের অর্থনীতি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এর মধ্যে অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা অন্যতম। এসব সমস্যা মোকাবিলা করা না গেলে অর্থনীতিতে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। এসব চ্যালেঞ্জের কারণে সামপ্রতিক সময়ে উৎপাদন খাতও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় এর জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে

www.facebook.com/tanbirebooks

শক্তিশালী করে তাকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ন। বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স আসছে। এ রেমিটেন্স কিভাবে, কোথায় ব্যবহার হবে তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। যদিও এসব রেমিটেন্স উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে পারতো।

প্রতিবছর রেমিটেন্সের প্রবাহ বাড়ছে। রেমিটেন্স দিয়েও উন্নয়ন করা যেতো। কিন্তু এ নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল বাড়ানোর দক্ষতা, জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু এ ক্যাপিটাল কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে কোন নীতি নেই। এ রির্জাভ অর্থনীতিতে ক্ষতির কারণ হবে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত এগিয়ে। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ দরকার। বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও অর্থনীতিতে মত পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এক্ষেত্রে সকলকে অংশগ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে ফার্মিং, ফার্টিলিটি, খাদ্য খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ভাল অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির এ অগ্রগতি ধরে রাখার বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন, গ্রামীণ উন্নয়নের ধীরগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি, ভূমিধস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রমুখ। এসব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারলে অর্থনীতিতে বড় অগ্রগতি সম্ভব। তবে উদার রাজনীতির নীতি এদেশে চালু করতে না পারলে আমরা কোন ভাবেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা, অর্থনীতির গতি ধরে রাখা, রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও বন্ধ করা- এসব বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য থাকা দরকার। মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য তৈরি করতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সরকার-বিরোধী দলের মধ্যে সংলাপ হতে হবে।

রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও সরকার থাকা প্রয়োজন। এখন ক্ষমতায় যাওয়া ও প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। দেশপ্রেমের রাজনীতি নেই, যা থাকা খুবই জরুরি।

নব্বইয়ের দশকের পর ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি খাত চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে বিশ্বের ১১টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশও আছে। এ দেশের বঙ্গোপসাগর ঘিরে এরই মধ্যে অর্থনৈতিক মোর্চা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

চীন জনশক্তিকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের বিপুল জনশক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। রাজনৈতিক নেতাদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ভালো মানুষ তৈরি করতে পারলে সন্ত্রাস, অনাচার, লুটপাট স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের স্থিতিশীল রাজনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাংবিধানিক কাঠামোয় আমাদের সবাইকে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভাজিত রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সহিংস রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

১৮দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অবদান অপরিসীম। দারিদ্র্য বিমোবচনে সরকারি ও বেসরকারি

নানাবিধ উদ্যোগ কাজ করছে। এখনও বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার হার ৩১.৫ শতাংশ। সহস াব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা হল ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট বলতে শুধুমাত্র গ্রামীণ ব্যাংক বা এনজিওর কার্যক্রমকে বোঝায় না। এখানে সরকারি উদ্যোগও বিবেচনা করতে হবে। বহু আগে সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমাজসেবা অধিদফতর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, সমবায় অধিদফতর প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রথমে সরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে পিকেএসএফ ও এসডিএফ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ যথাক্রমে ৫০ কোটি ও ২৮৮.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ৩৪২.৭০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মহিলাদের আর্কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৭৩টি উপজেলায় ৩২২৫ লাখ টাকা ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন স্ব-কর্মসহায়ক ঋণ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে ১২০ লাখ টাকার তহবিল প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কৃষি সমবায় সমিতি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ৪৭৪টি এবং শেয়ার মূলধন ৪৬০.৪৭ লাখ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪৩.০৯ লাখ টাকা। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ১৭,০৪৬ লাখ টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার ৯২.৯৩ শতাংশ। দেশের পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন (পিডিবিএফ) ফাউন্ডেশনের আওতায় ৭টি বিভাগের ৪৪টি জেলার ৩১০টি উপজেলায় ফেব্র"য়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৫,৫২২ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

১৯।সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং সুশাসন

উন্নয়ন বলতে সাধারণত কোনো কিছুর ইতিবাচক পরিবর্তন বা অনুন্নত স্তর থেকে উন্নত স্তরে উত্তরণকে বোঝায়। সামাজিক উন্নয়ন বলতে অনগ্রসর সমাজকে অগ্রসর সমাজে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতাকে বোঝায়; যা সমাজ জীবনের আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটায়। এই অনগ্রসর বা দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বহু কল্যাণমুখী এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার প্রেক্ষিতে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যার হার বর্তমানে ২৬ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকে গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত এক দশকে (২০০১-২০১০) বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি অথচ এর ঠিক আগের দশকে (১৯৯০-২০০০) দারিদ্র্য মানুষের সংখ্যা কমেছে মাত্র ২৩ লাখ; যা পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। তবে তা গ্রামের তুলনায় শহরে দারিদ্র্যের হার হ্রাস বরাবরই ছিল অধিক। শুধু ২০১০ থেকে ২০১৫ এই বিগত ৫ বছরে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অগ্রগতির পেছনে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ এবং একেই সঙ্গে সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' হলো এই উদ্যোগের একটি কার্যকর ফসল। তথাপি এই নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ করে কর্মসূচির আওতাধীন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রশাসন, স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং কমিউনিটি লিডারদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাভোগী বাছাইকরণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয়হীনতা এবং যথাযথ

www.pathagar.com

মনিটরিংয়ের অভাবে প্রকৃত লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী এই সুফল থেকে প্রায়শ বঞ্চিত হচ্ছে। সম্প্রতি দেশি এবং বিদেশি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন এবং উন্নয়নকর্মীদের পর্যবেক্ষণেও বিষয়টি উঠে এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে এদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক আর এই নির্দেশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রাপ্ত ফলাফল। মোটা দাগে এই কর্মসূচির দুটি খাত হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত এবং এর আওতায় প্রধান কার্যক্রম হলো চারটি যথা এক. নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম। চলতি অর্থ বছরে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা, এতিমখানা, দুর্যোগ, রেশন এবং অবসর ভাতাসহ প্রথমটির আওতায় মোট কার্যক্রম আছে ১৮টি। দুই. খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, জিআর এবং খাবিকাসহ মোট কার্যক্রম রয়েছে ৭টি। তিন. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম; যেখানে ক্ষুদ্র ঋণ, পুনর্বাসন তহবিল, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ মোট কার্যক্রম আছে ১৮টি। চার. উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে ছাত্র বৃত্তি, স্কুল ফিডিং, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, আশ্রয়ণ, চর উন্নয়ন, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গত অর্থবছরে নতুন সংযোজিত ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ছিল ৫২টি। বিগত অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৯,৮৩৭.৪৬ কোটি টাকা; যা মোট বাজেটের ৮.৯২ শতাংশ এবং মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬৮০.৩৯ লাখ। এ সব বরাদ্দের মূল উদ্দেশ্য একটি; তা হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত মানুষগুলোকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের করে নিয়ে আসা। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রমগুলো যে সব মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় যথা সমাজ কল্যাণ, খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু অধিদফতরের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাপর ওরগেনগুলো অনেকাংশে সঠিকভাবে কাজ না করায়, সরকার এ কার্যক্রমে আশানুরূপ সফলতা পাচ্ছে না। যার প্রেক্ষিতে স্থানভেদে হতদরিদ্ররা আরো বেশি হতদরিদ্র হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বারদের যোগসাজশে কোনো কোনো স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি লিডাররা তাদের পছন্দমতো লোকদের নগদ বা ত্রাণের কার্ডগুলো বিতরণে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফলে যারা সুবিধাভোগী হচ্ছে তাদের মাপকাঠি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; ভিত্তি হচ্ছে তাদের পছন্দের দলের সমর্থক কিনা কিংবা নির্বাচনে সে কাকে ভোট দিয়েছিল সেই মাপকাঠিতে। তথ্যমতে, মোট দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ৫ ভাগের ২ ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আসার সুযোগ পায়। যারা সুযোগ পায় তাদের ৩ ভাগের ২ ভাগ পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করতে পারে। যত লোক এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আসার সুযোগ পায় তাদের ২ শতাংশ মাত্র দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার সক্ষমতা অর্জন করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ইতিবাচক দিক হচ্ছে, মোট সুবিধাভোগীর ২৮ শতাংশ মহিলা। অপর এক তথ্যে দেখা যায়, ভিজিএফ কার্ড যখন বন্যার সময় বিতরণ করা হয় তখন ২০ শতাংশ লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া বাংলাদেশ উন্নয়ন সিরিজ গবেষণা এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির এক সময়কার প্রশিক্ষণ হিসেবে আমার কাছেও মনে হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম আর ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সেইফটি নেট করা এক বিষয় নয়। কারণ ক্ষুদ্রঋণ তাদেরই দেয়া হয় যাদের সমুদয় অর্থ সুদসহ পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে। কিন্তু হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব। তাই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ইস্যুতে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কাজ করায় আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো কিছু স্থানীয় সরকার পর্যায়ের প্রশাসনের লোকদের কাছে 'নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমটি' এক ধরনের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক জবাবদিহিতার পূর্বশর্তই হচ্ছে সুশাসন এবং সরকারি সেবাসমূহে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ। তাই স্থানীয় সরকার প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি করা গেলে এর সুফল খুব দ্রুততম সময়ে এদেশের দরিদ্র জনগণ পাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও তাদের উপস্থিতিতে বাজেট ঘোষণা, নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম বিষয়ে সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান, মিডিয়াতে কার্যক্রমভিত্তিক অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি আলোচিত সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, সামাজিক নিরীক্ষণ চালু, কমিউনিটি স্কোরকার্ড, পাবলিক কমিশন, উপদেষ্টা বোর্ড গঠন, জনশুনানি, জনমতামত বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে। বর্তমানে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়; যে কারণে সমন্বয়হীনতার প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় কিংবা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা কোনো অধিদফতর এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করতে পারে। প্রায় শতকের কাছাকাছি কার্যক্রম; যার বাজেট মোট বাজেটের ৯ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত (অর্থবছরের তারতম্যভেদে) বরাদ্দ হয়, সেখানে এই প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন হতে পারে আরেকটি কার্যকর উদ্যোগ। ইউনিয়ন পরিষদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সফটওয়্যারভিত্তিক ডাটা ব্যাংক

তৈরি করা; যেখানে কর্মসূচি অনুযায়ী সুবিধাভোগী নির্ণয়ের নির্দিষ্ট কিছু ইনডিকেটরস সেটিং করা থাকবে। প্রাথমিকভাবে কোনো সুবিধাপ্রত্যাশী ব্যক্তির বিষয়ে ডাটা ইনপুট করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সদস্য সুবিধাভোগী হতে পারবে কিনা তা প্রোগ্রামটি বলে দেবে এবং যা কেন্দ ীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। এতে সদস্য নির্ণয়ে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ যেমন কমে আসবে পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং কার্যক্রমও সহজ হবে। ইপি চেয়ারম্যান মেম্বাররা প্রায়ই নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্ড বন্টনে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং এ বিষয়ে অধিক সময় ব্যয় করেন। যে কারণে তারা ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক উন্নয়নে অপরাপর কার্যক্রমে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে না। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার পর্যায়ে যেমন সুশাসন নিশ্চিত হবে, পরিষদ তার নিজস্ব আয় বাড়িয়ে যেমন হবে শক্তিশালী; তেমনি নিশ্চিত হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত কল্যাণ।

২০।দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনীতির বিকাশে চাই টেকসই নিরাপত্তা বেষ্টনি

নিরাপত্তা বেষ্টনির ধারণাটি বাংলাদেশে নতুন নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে জনগণের দুর্দশা লাঘবে এটি সর্বপ্রথম চালু করেছিলেন। তিনি রেশন, খোলাবাজারে ভোগ্যপণ্য বিক্রি ও রিলিফ বিতরণ কর্মসূচি শুরু করেন। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেন। ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ বন্যার কারণে জনগণ নতুন করে দুর্ভোগে পড়ে। মানুষ অর্থনীতিতে অবদান রাখার পরিবর্তে জীবনধারণই প্রধান করণীয় হিসেবে বেছে নেয়। সরকার রিলিফ দেয়ার পাশাপাশি গরিব ও দুঃস্থদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চালু করে। তখন জনগণ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় বিরাট অবদান রাখে এই নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিগুলো। পরবর্তীতে জাতিসংঘ এ ধারণা গ্রহণ করে। তারাও একমত হয় যে, মানুষের কর্মশক্তিকে উজ্জীবিত রাখতে তাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাই আশির দশকে জাতিসংঘের উদ্যোগে কাজের বিনিময়ে খাদ্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দরিদ্র দেশগুলোতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। ধনী দেশগুলো এতে সহায়তা করে। ইউএনডিপি'র এসব কর্মসূচি আজও অনেক দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দারিদ্র্যকে সহনীয় করছে। দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে। মানুষের স্বাভাবিক কর্মশক্তি প্রয়োগ–সামর্থ্যকে টিকিয়ে রাখছে। অর্থনীতিতে অবদান রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। একটি দেশ যত দ্রুত দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা তত তাড়াতাড়ি বাড়বে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ সুগম হবে। তাই দারিদ্র্যপীড়িত সব দেশেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বাংলাদেশের সেই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় গতি আসে। সেইসাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও দ্রুততর হয়। সরকারের এ প্রচেষ্টায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিগুলো বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ আশির দশকে কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মূল সমস্যা দারিদ্র্য দূর হয়নি। এটি লক্ষ্যও ছিল না। দারিদ্র্যকে সহনীয় করাই ছিল মূল কাজ। এসব সহায়তার বড় অংশটাই মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে চলে যেত। প্রকৃত উপকারভোগীরা খুব সামন্যই পেত। এর ফলে দারিদ্র্য কমেনি। অর্থনীতিতেও গতি আসেনি। যদিও এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছরের বাজেটে কর্মসূচিভিত্তিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। নব্বইয়ের দশক থেকে বিশেষ করে দশকের দ্বিতীয়ভাগে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বেঁচে থাকার পাশাপাশি মানুষের কর্মশক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। দরিদ্র, বৃদ্ধ, দুঃস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তাসহ অবহেলিত জনগোষ্ঠির জন্য মাসিক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়। গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে বৃত্তি ও উপবৃত্তি চালু করা হয়। তবে এসব কর্মসূচি গ্রহণ, উপকারভোগী শনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল পরবর্তীকালে সরকার এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পরাক্রমশালী মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে তা বের করে আনা ছিল একটি দুরুহ কাজ। এটি আরো কঠিন হয়েছে উচ্ছিষ্টভোগী আমলা শ্রেণির বাধার জন্য। তারপরও সরকার আজ এ লক্ষ্যে অনেকটাই সফল হয়েছে।

www.facebook.com/tanbir.ebooks

কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকৃত উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ এবং বরাদ্দের সিংহভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে। এতে সরকারের কল্যাণধর্মী রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে। সরকার কর্মসূচিগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে। তাই এগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এই দুইভাগে চিহ্নিত করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাএই – মৌলিক পাঁচটি চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার সেভাবে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করছে। সরকার বুঝতে পেরেছে যে, বহু বছর ধরে বিভিন্ন ভাতা ও কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফএর মতো – সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো দারিদ্র্যকে সহনীয় করছে। কিন্তু অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। সামাজিক উন্নয়নে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। এটা অনেকটা বেসরকারি সংস্থাগুলোর উচ্চসুদে দেয়া ঋণের মতো। গ্রামের দরিদ্র নারীপুরুষ পাঁচ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নেয়ার সময় থেকে উচ্চ সুদ ও আসল– পরিশোধ করা শুরু করে। এ সামান্য টাকা দিয়ে অভাবের সংসারে কোনো উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না। কিন্তু সপ্তাহ শেষে সুদাসল ফেরত দিতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে তারা আরেকটি এনজিও থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নেয়। দুই এনজিও'র সুদাসল দেয়ার চাপ থেকে থেকে মুক্ত হতে এক সময় তৃতীয় এনজিও থেকে ঋণ নেয়। এভাবে গ্রামের অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা পাঁচসাতটি এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে– দিশেহারা হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য বিমোচন সেই তিমিরেই থাকে। উপরন্তু বংশানুক্রমিকভাবে ঋণগ্রস্থ থাকা নিশ্চিত হয়। তাই সরকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষমতায়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এর মধ্যে নামমাত্র সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার গত চার বছরে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ও ১৯৭ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মোট ৭ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ এ ঋণ নিয়েছে। এরমধ্যে ৬৪ লক্ষ ৭৬ হাজার নারী ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা। সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের ভাতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান, প্রান্তিক চাষিদের বিনামূল্যে বীজ ও সার দিয়ে চাষাবাদ করার সুযোগ, নামমাত্র সুদে নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মূলধন যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, জেলেদের পুনর্বাসন,সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলা, একটি বাড়ি একটি খামার, শহরের জনগণের পরিবেশগত স্বাস্থ্য উন্নয়ন, ভূমিহীনদের জন্য আশ্রয়ণ, চর উন্নয়ন, কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, উত্তরবঙ্গের বেকার যুবশ্রেণির কর্মসংস্থান, শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা, ন্যাশনাল সার্ভিস, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতেও নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে সমাজের সব ধরনের ক্ষত ও অবহেলাকে বিবেচনায় নেয়া যায়। যেমনদুই বছর ধরে দলিত –, হরিজন, বেদে এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক অবাঙালি মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিভিন্ন কারণে তারা নাগরিক সুবিধা প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সরকার এই অবাঙালিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়েছে। দুর্যোগের সময় অর্থ ও ত্রাণসামগ্রীর অভাবে অনেকে মারাও যায়।

এটা অনেকটা বেসরকারি সংস্থাগুলোর উচ্চসুদে দেয়া ঋণের মতো। গ্রামের দরিদ্র নারীপুরুষ পাঁচ হাজার টাকা– ক্ষুদ্র ঋণ নেয়ার সময় থেকে উচ্চ সুদ ও আসল পরিশোধ করা শুরু করে। এ সামান্য টাকা দিয়ে অভাবের সংসারে কোনো উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগের সুযোগ থাকে না। কিন্তু সপ্তাহ শেষে সুদাসল ফেরত দিতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে তারা আরেকটি এনজিও থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নেয়। দুই এনজিও'র সুদাসল দেয়ার চাপ থেকে থেকে মুক্ত হতে এক সময় তৃতীয় এনজিও থেকে ঋণ নেয়। এভাবে গ্রামের অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা পাঁচসাতটি এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে – দিশেহারা হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য বিমোচন সেই তিমিরেই থাকে। উপরন্তু বংশানুক্রমিকভাবে ঋণগ্রস্থ থাকা নিশ্চিত হয়।

হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি বাংলাদেশের এ অর্জনকে বিরল ও চমকপ্রদ বলে আখ্যা দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য তথা দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য পূরণ করেছে দুই বছর হাতে রেখেই। জাতিসংঘের ২০১৫ সালের মধ্যে এ লক্ষ্য পূরণের সময় বেঁধে দিয়েছিল। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাসের পিছনে বড় ভূমিকা রেখেছে বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিগুলো। সরকার ২০০৯১০– অর্থবছরে ১৬ হাজার ৭০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ২০১০ ২৪ অর্থবছরে ১১– টি কর্মসূচি৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫৬ হাজার, ২০১১১২– অর্থবছরে ২১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪টি কর্মসূচি এবং ২০১২অর্থবছরে ১৩– ২৩ হাজার ৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৩১৪– অর্থবছরে ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাসের ইতিবাচক প্রভাব

পড়েছে অর্থনীতিতে। দেশ গত চার বছর ধরে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি হার বজায় রেখেছে। গড়ে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালের ৬৩০ ডলার থেকে ৯৩০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ধনীগরিব বৈষম্য কমেছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছ-ে। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়েছে, যা প্রবৃদ্ধি অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। উত্তরাঞ্চল মঙ্গামুক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য থেকে উঠে আসা এই মানুষগুলো পূর্ণ উদ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকা◌ে নিয়োজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নারীদের অগ্রযাত্রা- দ্রুততার সাথে হয়েছে। গ্রামের নারীরাও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। পোশাক শিল্পে নারীরা নিয়োজিত হয়ে পরিবর্তন করছে তাদের ভাগ্যের রেখা। তারা দারিদ্র্যমুক্ত হচ্ছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েরা অধিক যতœ নিতে পারছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি মেয়েরা নিজেদের ও পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষতা আরও বাড়ানো সম্ভব হলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে। বিশ্বব্যাংকও বলেছে, প্রকৃত দরিদ্রের কাছে সাহায্যেও পুরোটা পৌঁছুতে পারলে দারিদ্র্য আরও দেড় থেকে দুই শতাংশ কমতো। তাহলে প্রবৃদ্ধি হার আরো বেশি অর্জিত হতো। তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অপচয় শূন্যে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বাস্তবায়ন দক্ষতা বাড়াতে হবে। ভাতাভোগী ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষমতায়নের সুবিধাভোগীদের একটি ড্যাটাবেইজ তৈরি করতে হবে, যাতে কেউ একাধিক কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে আবার কেউ একটিও পাচ্ছে না এমন না হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনতে হবে। তাহলে সাহায্যের বাইরে থাকা মানুষগুলোর দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত হবে। দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও দ্রুত সমৃদ্ধ হবে ।

ধন্যবাদ

মাহবুব অর রশিদ

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com